পয়মন্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ সন
রবিবার : ইংরাজী ১৯৬০ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলকাতা-৬ ।

'রা—ম্বা'

শ্রীসদ্জন চন্দ

করকমলেষু

লেখকের অন্য বই

মানবজমিন

দূ'চোখে

কাঁচের মানুষ

ব্যাধ

গোলাপের কাঁটা

ছায়াময়ী

পারাপার

ঘুণপোকা

আক্রান্ত

প্যাপ

পয়মন্ত

১

সীতাপুরে পাটের গুছি কিনতে এসে ভারী মন খারাপ হয়ে গেল গোপালের। আজকাল তার এটা হয়। মনটা মাঝে মাঝে বড্ড খারাপ লাগে। পাটের কারবারী মদন বিষয়ী চেনা লোক। পাট ছাড়াও তার তামাক আর ভূষিমালেরও ব্যবসা আছে। বেশ বড় আড়ত, না হোক পাঁচ সাতজন কর্মচারী খাটছে। আজ সীতাপুরের হাট। তাই বিকিকিনি একেবারে জমজম করে হচ্ছে। বাজার ঘিরেই হাট। রথতলা অবধি থিক থিক করছে মানুষ।

এই হাটবাজার, জমজমাটি ব্যাপার স্যাপার গোপালের বড় ভালো লাগে। আজও যে লাগছিল না তা নয়।

মদন বিষয়ী বললো, পাটের গুছি কিনবে তা অত তাড়া কিসের? ওই ডালের বস্তাটার ওপর চেপে বসে থাকো, জিরোও, হাড়ে একটু বাতাস লাগুক। জ্যাঠা তো খাটিয়ে জান কয়লা করে দিয়েছে। এই ফুরসতে একটু জিরিয়ে নাও। দেখছো তো অবস্থা, চিটেগুড়ে যেন মাছি পড়েছে। একটু ফাঁক বুঝে দেবো খন।

কথাটা একটু আঁতে লাগলো গোপালের। সে যে একটু গবেট তা সবাই বলে। নিজেই সে তেমন টের পায় না। আসলে কি, সে মানুষের মুখ দেখে মনের কথা টের পায় না, কোনোও বৃত্তান্তের ভিতরের প্যাঁচটা তার কাছে ধরা পড়ে না, আর সে পেটের কথা পেটে রাখতে পারে না। মাথাটায় তেমন ভাবনা-চিন্তাও আসতে চায় না তার। এই যেমন, যখন সে পাঁউরুটি খায়, চায়ে ভিজিয়ে, তখন পাঁউরুটি কেমন চায়ে ডুব মেরে বাদামী রং ধরে আর কেমন পুচপুচে মিষ্টি হয় তা দেখতে দেখতে সে

এমন মজে যায় যে, গোটা দুনিয়াটাই তার ভুল পড়ে যায় তখন। পাঁউ-রুটি আর চা ছাড়া তখন আর কিছু মনেই থাকে না। যখন কাঠ কাটে, জল তোলে, গোয়াল পরিষ্কার করে বা বাগান কোপায় তখনও সেই অবস্থা। যখন যেটা করছে তখন সেটাই তার জানপ্রাণ। তার বুদ্ধির প্রশংসা নেই বটে, কিন্তু গতরের দাম আছে। সবাই তাকে খাটায়, হাতের কাছে পেলেই হলো। ঘর গেরস্থালি ক্ষেত গোয়াল ইটভাঁটার কাজ তো আছেই, এ ছাড়া সাঁঝবেলায় বড়দার গা দাবানো, সেজো খুড়োর পিঠ চুলকোনো বা মেজো জ্যাঠাইমার পাকা চুল তোলা এসবও তার আছে। আগে লাগত না, কিন্তু আজকাল কেউ কাজের কথাটা তুললে তার আঁতে লাগে।

সেদিন মাকালতলার গৌরহরি বটতলায় তাকে বসিয়ে একখানা বিড়ি সেধে বললো, তুই যা করিস তাতে মাস গেলে হেসেখেলে তোর মাইনে হওয়া উচিত দুশো টাকা আর চারবেলা খোরাকী। জ্যাঠার সংসারে কেন যে ডাঁশের মতো লেগে আছিস বাবা। নীলাম্বরের খামারে কাজ করতে চাস তো ও-ই পাবি। দু দশ টাকার এধার ওধার হতেই পারে, কিন্তু অন্যায্য হবে না।

বিড়িটা খায়নি গোপাল, তবে হাত পেতে নিয়েছিল। নেশাটেশা এখনও ধরে উঠতে পারেনি সে। গৌরহরি কাজের মানুষ, অনেক ধান্ধা। কথাটা পেড়েই ছাতা আর ছেঁড়া প্লাস্টিকের ব্যাগ দু' বগলে চেপে উঠে পড়লো। বললো, মতলব ঠিক করে তেজেনের দোকানে খবর দিস। আর কথাটা খবর্দার পাঁচ কান করিসনি। বাগড়া দেওয়ার লোক সব চারদিকে মুখিয়ে আছে।

একা বাঁধানো বটতলায় বসে বিড়িটা দু হাতের চেটোয় চেপে অনেকবার পাকালো সে। দুবার কাকে হেগে গেল গায়ে। খেয়াল করলো না। কিন্তু মাথাটায় তেমন কিছু খেললো না। গৌরহরির প্রস্তাবটা কেমন, ভালো না মন্দ, ভিতরে অন্য কোনোও প্যাঁচ আছে কিনা এসব ভেবে বুদ্ধি বিবেচনা

খাটিয়ে তবে একটা রফায় আসতে হয়। তা গোপালের মাথায় কোনো বুদ্ধিই ঘাই মারে না যে।

তবে এটা ঠিক কথা যে, তাকে কেউ কিছু তেমন দেয় টেয় না। এই এতকাল অবধি সে অন্যের পুরোনো জামাকাপড় পরেই লজ্জা নিবারণ করে এল। এমন কি পায়ের জুতোজোড়া অবধি অন্যের পুরোনো জিনিস। হাতে টাকাটা খুবই কম জোটে। মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু তার একটু জিনিসপত্র পেতে বা কিনতে ইচ্ছে করে। ধরো একখানা লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের চিরুনি, তাতে ক্লিপ আঁটা যাতে বুক-পকেটে গুঁজে রাখলে মাথাটা একটু উঁচিয়ে থাকে আর ভারি বাহার হয়। ফটিকের পকেটে সবসময়ে থাকে একখানা। ধরো, তার একখানা নস্যি রঙের র‍্যাপারেরও বড় শখ। গোলকবাবু শীতকালে যখন দাদুর গদিতে তাস খেলতে আসেন তখন গায়ে কায়দা করে চাদরখানা লেপটে থাকে। সেই র‍্যাপারে অবশ্য পাড় আছে, গোপালের অতটা দরকার নেই। ধরো একখানা খাপী বাঁকড়োর গামছা, বেশ চৌখুপী কাটা, গা মুছতে ভারী আরাম। জ্যাঠাইমার একখানা আছে ওরকম।

তা এইসব শখ আহ্লাদ আর মেটায় কে?

গৌরহরি বলে কথা নয়। সেদিন কাহারপাড়ার বিষ্ণুও বলছিল, ওরে গোপাল, তোর মাথায় দিব্যি কাঁটাল ভাঙছে তোর জ্যাঠাজেঠি। তা এইভাবেই জীবনটা নিকেশ করবি ভেবেছিস?

মুর্গী হারুর হাঁস মুর্গী আর ডিমের ব্যবসা। সেই থেকে নাম মুর্গী হারু। তা সেই হারুও মাঝে মাঝে চোখ টিপে বলে, কেটে পড়, কেটে পড়। তোর হালিশ বের করে দেবে। তোর জ্যাঠা ওই বিনোদ বুড়ো হলো এক নম্বরের হেদ্দোড়।

তাই আজকাল গোপাল ভারী ভাবিত হয়ে পড়ে। হচ্ছেটা কী? অ্যাঁ। এসব কী হচ্ছে।

সবচেয়ে আঁতে-ঘা দেওয়া কথাটা এতকাল আর কেউ বলেনি। সেদিন

সেই সব্বোনেশে কথাটাই বলে বসল বাসন্তী বউঠান। নতুন বউ। গত মাঘে গোপালের জ্যাঠতুতো দাদা পরান বিয়ে করলো। খাইয়েছিল খুব। বিয়ে বউভাতে এত খাবার দাবার হলো যে, গোপালের আর বাহ্যজ্ঞান ছিলো না। জিব থেকে পেট অবধি যেন খুশিতে একেবারে বান ডেকে গেল। তা সেই আনন্দের পরই ভারী নিরানন্দ হতে হলো একদিন। তার দোষ নেই। কুয়োতলায় মেয়েরা চান করে, বেড়াটা অনেককাল ভাঙা। নতুন বউ আসায় জ্যাঠা একদিন গোপালকে ডেকে বললো, ওরে বেড়াটা নতুন করে বাঁধ তো। বেশ মজবুত করে বাঁধবি আর একখানা ভালো আগড়ও দেয়ে দিস।

সারা সকাল যত্ন করে করে বেড়াটা বাঁধল গোপাল। যখন শেষ হওয়ার মুখে তখন ভারী চেঁচামেচি শুনতে পেলো। কাজে লাগলে গোপালের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এবারও ছিলো না। কুয়োতলার মধ্যেই মস্ত কচু-গাছের আড়ালে উবু হয়ে বসে কাজ করছিলো, পেছনদিকে যে নতুন বউ এসে চানে ঢুকেছে তা কে জানবে বাবা? বেড়াটা শেষ করে খুশিমুখে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখনই হঠাৎ চিল-চেঁচানি, উম্মা গো। এম্মা গো। কোথাকার বেহায়া ছোটোলোক তুমি, মেয়েমানুষের চান করার জায়গায় ঢুকে বসে আছো?

গোপাল ভারী অপ্রস্তুত। কুয়োতলায় নতুন বউ বাসন্তী সদ্য বোধহয় উদোম হয়েছিল, কোনোওরকমে ছাড়া জামাকাপড় টেনে শরীর চাপা দিয়ে ফুঁসছে।

কুয়োতলাটা একটু দূরে বলে রক্ষে। নইলে রদ্দা খেতে হতো গোপালকে।

গোপাল আমতা আমতা করে বলল, বেড়া বাঁধছিলুম যে!

বউটা ভ্রু কুঁচকে, ঠোঁট চুমড়ে এমন একখানা মুখ করেছিল যেন পারলে গোপালকে তুলে কুয়োয় ফেলে দেবে। গলার ধারও খুব। বললো, অতই যদি মেয়েমানুষের আদুর গা দেখার শখ তো বিয়ে করলেই হয়। বয়স তো কম হয়নি, আর মেয়েমানুষেরও অভাব নেই।

গোপাল তবু বললো, বেড়া বাঁধছিলুম যে।

হুঁ, বেড়া বাঁধছিল। সব জানি। এখন যান তো, বিদেয় হোন।

কী কথা বললে ভালো হতো কে জানে। পোড়ার মাথায় কথাও যে তেমন যুৎমতো আসে না। দোষঘাট কী হলো তাও ভালো বুঝতে পারল না সে। তবে বেরিয়ে এল। আগড়টা ঠাস শব্দ করে বন্ধ করে দিলো নতুন বউ।

অপমান নয়, ভয়ে ভয়ে দিনটা কাটলো। গোপালের বুদ্ধি না থাক, কোনো কারণে সে জানে, বউ নালিশ করলে তার কপালে কষ্ট আছে। পরাণ মহা খচ্চর লোক। রাগীও খুব। মুখ চলার আগে তার হাত চলে।

কপালটা ভালো। ব্যাপারটা বোধহয় কারও কানে তোলেনি বাসন্তী। কিন্তু আঁতে লেগেছিল। তার বিয়ের কথা এরকমভাবেও তো কেউ কখনও বলেনি। ওই যেমন চিরুনি, নস্যি রঙের চাদর কি বাঁকড়োর চেক-কাটা গামছা, তেমনি আবার বউয়েরও তো একটা শখ থাকতে পারত গোপালের।

না, ছিঃছিঃ, আতুর গা দেখার জন্য নয়। ওসব অনেক গুহ্য ব্যাপার। তা নয়। ওসব পাপ কথা মনে হলেই সে জিভ কাটে। তবে কিনা ওই বাসন্তীর মতোই একখানা রাঙা বউ বেশ ঘোমটা দিয়ে বেড়াবে, আর দাওয়ায় বসে গোপাল হাঁ করে দেখবে আর খুব বাহবা দেবে মনে মনে। এ ব্যাপারটা তেমন মন্দ নয়।

তা সেই থেকে গোপালের মনটা খারাপই যাচ্ছে একরকম। তার কি চিরুনি, চাদর, গামছা বা বউ কোনোটাই হতে নেই?

সীতাপুরের হাট পেল্লায় ব্যাপার। এমুড়ো ওমুড়ো দেখা যায় না। শীতের চাপানে এবার শক্ত জমি গরু বলদের ক্ষুরে আর টেম্পো বাসের ধাক্কায় গুঁড়ো হয়ে ধুলোর একেবারে গন্ধমাদন তুলে ফেলেছে। হল্লাগুল্লাও খুব। বিষয়ীর পো এদিকপানে তাকাচ্ছেই না। গোপাল বস্তা থেকে নেমে গুটিগুটি হাট দেখতে বেরিয়ে পড়ল। এই যে মদন ফের একটু খোঁচা

দিলো, এই যে জ্যাঠার সংসারে তার হাড়ভাঙা খাটুনির কথাটা মনে করিয়ে দিলো, এর মানে কি? তবে কি কাজটা তার উচিত হচ্ছে না? অন্যায্য হচ্ছে?

তার পেটে কথা থাকে না বলে গৌরহরির প্রস্তাবটাও সে একদিন ফট করে বলে ফেলেছিল জ্যাঠাইমাকে। পাকা চুল বাছতে বাছতে ভারী বাহাত্বরীর গলায় বললো, বুঝলে গো, তোমরা তো আমার দাম দাও না, ওদিকে গৌরহরি যে দুশো টাকা মাইনের চাকরি ঠিক করেছে আমার জন্য। চারবেলা খোরাকি।

জ্যাঠাইমা বুড়ো মানুষ হলেও দাপটে এখনও বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। মাথাটা সরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে গোপালের মুখখানা একবার দেখে নিয়ে বললো, কোন্ গৌরহরি? মাকালতলার সেই বদমাশটা?

সে-ই।

চাকরি সাধছে তোকে?

হ্যাঁ। খুব ঝোলাঝুলি।

জ্যাঠাইমা একটুক্ষণ চুপ মেরে থেকে বললো, তোর বাপ আর মা যখন মরলো তখন তোর বয়স কত ছিলো জানিস?

সে আর জানিনে? তিন বছর। তুমিই তো কতবার বলেছো!

সেই তিন বছর থেকে তোকে আর তোর পাগলী দিদিটাকে কোলেপিঠে করে টেনে হিঁচড়ে মানুষ কে করলো বল! তোর দিদির যে অমন ভালো বিয়েটা হলো সেটাই বা দিলে কে? দানসামগ্রী বরপণে তোর জ্যাঠার কত টাকা কলের জলের মতো বেরিয়ে গেল তা জানিস?

গোপাল এসব জানে। বিস্তর শুনেছে।

জ্যাঠাইমা ফের বললো, এসব লাগানি ভাঙানির লোক তো নানা কথা কইবেই, কিন্তু তোর পিছনে এই যে আমরা পাঁচজনা রয়েছি, নজরে নজরে রাখছি তোকে এটা আর কেউ করবে?

গোপাল তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে, না। আর কে করবে?

তাহলে ? গৌরহরি লোক ভালো নয়। নিজের আগের পক্ষের বউটাকে গলা টিপে মেরে শালীর সঙ্গে বে বসল। সুখেন পালের বিধবা বউয়ের সম্পত্তি গাপ করল। আরও কত কীর্তি আছে। ওসব লোক কাছে এলে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে হাঁটা দিবি। বুঝলি ?

আচ্ছা।

আর তোর জ্যাঠাকে বলে গৌরহরির একটা ব্যবস্থা আজই করছি। হুঁঃ চাকরি দেবে। চাকরি তো জানি। বোকাসোকা পেয়ে দশগুণ খাটিয়ে দশ ভাগের একভাগ মজুরী।

কথাটা সত্যি না মিথ্যে, কতটা প্যাঁচ আছে ভিতরে তা ধরতে পারে না গোপাল। বুদ্ধি দেওয়ার মেলাই আছে। কিন্তু এ এক বুদ্ধি দেয় তো অন্য-জন দেয় উল্টো বুদ্ধি। তাতে মাথাটা আরও গুলিয়ে যায় গোপালের।

সীতাপুরের হাটে এমন রমরমে ভীড়ের মধ্যেও ঘুরে ঘুরে মনটা কেমন ন্যাতানো লাগছিল। জ্ঞান হয়ে অবধি সকালে উঠে পেল্লায় উঠোন ঝাঁটানো, গোয়াল পরিষ্কার, গরু ছাড়া, খড় কাটা থেকে শুরু করে দিন-মানভর সে আর মাথা তোলার সময় পায় না। তার দিদি মালতীরও এই অবস্থাই ছিলো। মুখপুড়িকে ডাঁই ডাঁই বাসন মাজতে হতো, ঘর মুছতে হতো, কাপড় কাচতে হতো। বিয়ের পর খুব কেঁদেছিল। তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, তোকে এরা মেরে ফেলবে। আমি ঠিক তোকে নিয়ে যাবো।

তা সেই নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে পরে খুব হুজ্জোত হয়েছিল। বিয়ের বছরটাক পর মালতী যখন ভাইকে নিয়ে যেতে চাইলো তখন জ্যাঠাইমা কাকিমা সবাই মিলে এমন কুরুক্ষেত্র করে কুকুর তাড়ান তাড়াল মালতীকে যে সে আর এমুখো হতে পারেনি আজ অবধি।

সীতাপুরের হাটে ঘুরতে ঘুরতে এইসব বৃত্তান্ত মনে পড়ছে খুব। মনটা বড্ড নেতিয়ে যাচ্ছে। কয়েকখানা জিলিপি খেলে মনটাকে একটু তোলা যেত। কিন্তু পকেটে পাটের গুছি কেনার পয়সা ছাড়া বাড়তি আছে মাত্র

একখানা আধুলি। বাস-ভাড়া বাদ দিলে প্রায় কিছুই থাকে না।

জিলিপি না জুটলেই বা কী? জিলিপির দোকানের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও মনটা খানিক ভালো হয়ে যায়। চটের ছাউনির নিচে গনগনে আঁচে চ্যাপটা কড়াইতে ওই যে হাতের প্যাঁচ খেলছে আর গন্ধে মাৎ হয়ে যাচ্ছে চারধার এতেও খানিক কাজ হয়।

কোমরে একখানা কনুয়ের গুঁতো খেয়ে কঁক করে ওঠে গোপাল।

গোপাল না?

চেয়ে দেখে, চকবেড়ের নিমাই ঘোষ। টাকের চারধারে কোঁচকানো চুলের এমন একখানা খেলা আছে যা দেখলে সকলেরই ইচ্ছে যাবে অমন টাক নিজের মাথায় ফেলতে। নিমাই বাবুলোক। সীতেপুরের এই ধুলো-মাখা হাটেও একেবারে ফর্সা পাটভাঙা ধুতি, চকচকে একখানা টেরি-লিনের পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিব্যি। কাঁধে শাল-খানাও আছে।

জিলিপি খাবি তো এখানে কেন? ওই দিকে সতীশের দোকানে চলে যা, ও একবার খেলে আর অন্য মাল জিবে লাগবে না।

জিলিপি খাওয়ার পয়সা নেই এই কথাটা লজ্জায় কবুল করতে পারলো না বটে গোপাল, কিন্তু সে জানে মুখ ফুটে বলতে পারলে নিমাই খাওয়াত। সবাই বলে মাতাল-বদমাশ যাই হোক নিমাই ঘোষের দিল আছে। পয়সাও ছিল একসময়ে। তা পয়সা হলো গড়ানে জিনিস, এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকতে চায় না।

নিমাই ঘোষ তার ঘাড়ে হাত রাখল। এটা মস্ত খাতির বলে মনে হলো গোপালের। এক হাট লোকের সামনে স্বয়ং নিমাই ঘোষ তার ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটছে!

তা তোর ব্যাপার স্যাপার কী বল দেখি গোপাল। মুখখানা শুকনো দেখছি কেন? তোর মুখে তো সর্বদা একখানা ক্যাবলা হাসি লেগে থাকে। সেটা উবে গেল কেন? বাড়িতে ঠ্যাঙানি খেয়ে এসেছিস?

বিগলিত গোপাল বললো, না। এই নানা কথা ভাবছি আর কি।

ঘুনসিগঞ্জ—অর্থাৎ যে গাঁয়ে গোপাল থাকে সেখান থেকে চকবেড়ে মেরে কেটে দেড় মাইলও হবে না। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়। দোবেলা লোক যাওয়া আসা করছে। পাকা সড়ক। বাস টেম্পো চলছে অহরহ। নিমাই ঘোষের কে একজন আছে ঘুনসিগঞ্জে, কানাঘুঁষো শুনেছে গোপাল। গণেশের বিধবা বোন শিবানীই হবে বোধহয়। গোপাল সব কথা কানে তোলে না। লোক বলে, গণেশদের সংসার ওই নিমাই ঘোষই টানে। খুব যাতায়াত আছে।

ঘাড়ে নিমাই ঘোষের হাত এটা খুব সজাগ হয়ে খেয়াল রাখতে লাগলো গোপাল। ঘাড়টাকে একটু নরম করারও চেষ্টা রাখল সে, যাতে হাত রাখতে নিমাই ঘোষের কষ্ট না হয়, যাতে হাতখানা তুলে নেওয়ার ইচ্ছে না জাগে। এত বড় খাতির ইদানীং পায়নি গোপাল।

নিমাই ঘোষ একখানা বড় শ্বাস ফেলে বললো, ভাবিস! তোর আর ভাবনা কিসের রে ব্যাটা! দিব্যি আছিস। জ্যাঠা খাওয়ায় পরায় আর তুই গতরে খেটে শোধ দিস। ব্যাটা ল্যাটা চুকে গেল। তোর তো আর সংসারের পাঁচটা ব্যাপারে থাকতে হয় না। না রে গোপলা, তুই বেশ ভালো আছিস।

কথাটা একরকম ভালোই বলতে হবে। তাই সে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বললো, তা বটে। তবে কিনা—

পান খাবি?

পান! বলে চোখ বড় করলো গোপাল। তবে এ প্রস্তাবে সায় দেওয়া উচিত কিনা বুঝতে পারলো না।

আয়, ওই যোগেনের পানের হাতটা বড় ভালো।

দোকানে এসে কাঁধ থেকে হাত নামাল নিমাই। হাতখানা পান খাওয়া হয়ে গেলে ফের কাঁধে উঠবে কিনা তা বুঝতে পারছিলো না গোপাল। পান জর্দার গন্ধে জায়গাটা মাতলা মতো হয়ে আছে।

নিমাই ঘোষ তার জন্য মিষ্টি পানের হুকুম দিলো। পানটা মুখে দিয়ে একটু খিদে মতো টের পেল গোপাল। পানও খাওয়ারই জিনিস। সে অবশ্য বিশেষ খায়নি কখনও। মুখশুদ্ধি টুদ্ধির ব্যাপারও সে বোঝে না। পানটা সে যখনই খায় খাবার ভেবেই খায়। এখনও খাবারের মতোই হালুম হুলুম করে চিবোতে লাগলো।

সামনে বেঞ্চ পাতা। নিমাই ঘোষ গা ছেড়ে বসলো। পাশে একটু ফাঁক রেখে বললো, বোস রে গোপাল।

মস্ত সম্মান। গোপাল বসে গেল।

কতগুলো জিনিস গোপালের কাছে খুব পরিষ্কার। তারমধ্যে একটা হলো, গবেট হলেও সে জানে যে, দুনিয়াটা চলছে লেনদেনের ওপর। পয়সা ফেল, সব পাবে। এই যেমন সে গতরে খাটে, তার বদলে খোরাকি আর জামা কাপড় পায়। কিন্তু নিমাই ঘোষের এই পান খাওয়ানোটা লেন-দেনের মধ্যে পড়ছে না। পানটার দাম বোধহয় কুড়ি পয়সা হবে। কম নয়। এ বাজারে কে মাগনা কুড়িটা পয়সা খসাতে চায়? গোপালের সমস্যা হলো, এই পানের পয়সাটা তার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসে থাকবে।

পানটা গিলে ফেলে একরকম শাস্তি হলো। বেশ পান। মিষ্টি, ঘাসমতো, একটু ঝাঁঝও আছে, এলাচদানা আর মশলার গন্ধটাও বেশ। সে জিব দিয়ে দাঁতের ফাঁকে পান-সুপুরির কুঁচি খুঁজতে লাগলো।

নিমাই ঘোষ সিগারেট ধরিয়েছে। খায়না বলে বিড়ি সিগারেটের গন্ধ তেমন সইতে পারে না গোপাল। কিন্তু নিমাই ঘোষ বলে কথা। তার সিগারেটের গন্ধ বেশ ভালোই লাগে গোপালের।

নিমাই ঘোষের গালে পানের ঢিবি। জর্দাটা বোধহয় লেগেছে, বার দুই হেঁচকি তুললো। একবার পিক ফেললো। গালের ঢিবিটা অনেকক্ষণ থাকবে। নড়বে না, চড়বে না, এক জায়গায় থেকে যাবে। গোপালের পান কখন তল হয়ে গেছে।

বোঁটার চুন অনেকটা চেটে নিয়ে নিমাই ঘোষ বললো, তুই তো ভালো লোক। খুব ভালো লোক। শুনেছি তোর পয়সার লালচ নেই, কারও সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়ায় যাস না, জ্যাঠামশাই ঠ্যাঙালে নাকি চুপ করে মার খাস। সত্যি নাকি রে!

গোপাল মাথা চুলকোলো। মানী লোকের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস নেই। গলাটলা ঝেড়ে বললো, ঠিক বুঝতে পারি না।

কী বুঝতে পারিস না?

আমি লোকটা কেমন।

নিমাই ঘোষ সিগারেটে একখানা লম্বা টান মারলো। সাদা সিগারেটের মুখটায় পানের রাঙা ছোপ ধরেছে। মানী লোকের সবকিছুই আলাদা রকমের।

নিমাই বললো, তার মানে তুই লোক ভালো। ভগবান দুনিয়ায় ভালো মন্দে মিশিয়ে মাল ছাড়েন। তবে ওপরসা ওপরসা সব একেরকম। সেই দুটো হাত দুটো পা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেকটা একেকরকম। ওই-টেই হলো ভগবানের কায়দা। দিলুম সব মিশিয়ে, এখন এবার আলাদা কর তোরা।

এটা বেশ উঁচু থাকের কথা বলেই মনে হলো গোপালের। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললো তা বটে।

তুই ভালো লোক। আমার মনে হয় তুই বেশ ভালো লোক।

একথাটাতেও সায় দেওয়া উচিত কিনা তা ভাবতে গিয়ে একটু ফাঁক রয়ে গেল।

নিমাই ঘোষ বললো, তাই ভাবছি আজ তোর হাত দিয়ে বরাতটা পরীক্ষা করাব। আয়।

নিমাই ঘোষ উঠে পড়লো।

মানী লোক, তাই কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আর জিজ্ঞেস করলো না গোপাল। এঁরা যা করেন সবই ভালো।

বাজারের দক্ষিণে খালধারে একখানা টিনের ঘর। দরজা ভেজানো, জানালা আঁটা। নিমাই গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলো। ভিতরে দু তিনটে মোম জ্বলছে। বেশ জম্পেস তাসের আড্ডা।

নিমাই ঘোষ ঢুকে চাদরখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা আড় বাঁশে ঝুলিয়ে দিয়ে বললো, আজ আমার হয়ে গোপাল তাস তুলবে।

কেউ জবাব দিলো না কথাটার, তবে অনেকে তাকিয়ে দেখলো। হাতে তাস, সামনে পয়সা। জনা পাঁচেক লোক মড়ার মতো মুখ করে বসে। ঘরে বিড়ি আর সিগারেটের গুমোট গন্ধ।

নিমাই ঘোষ গোপালকে ঠেলেঠুলে ঐ পাঁচ জনের মধ্যে ঢুকিয়ে কসিয়ে দিলো। বললো, কোনোও চিন্তা নেই। আমার ছোঁয়াও পাপ। তুই তাস তিনটে যখন তুলতে বলবো তুলবি, আর আমাকে আড়াল করে দেখাবি। যা করার আমি করবো।

গোপাল ভালমন্দ তেমন বুঝলো না। তবে মানী লোকের কথা তো ফেলাও যায় না। একটু বাদে তার সামনে তিনখানা তাস উপুড় হয়ে পড়লো। তাস অবশ্য গোপাল চেনে। মাঝে মাঝে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে রঙ মিলান্তি খেলেছে।

নিমাই ঘোষ পিছন থেকে নামতার মতো বলতে লাগলো, ব্লাইণ্ড এক টাকা …ব্লাইণ্ড দু টাকা…

কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলো না গোপাল। তবে এ ঘরে তার ভারী হাঁসফাস লাগছে। শীতেও কেমন ঘাম হচ্ছে।

নিমাই ঘোষ তাস তোলার হুকুম দিলো। তারপর তাস দেখে হেঁকে একটা বড় দান দিলো। অন্যরা ফটাফট তাস ফেলে হাত ছাড়ল। আর নিমাই তার ঘাড়টা খিমচে ধরে বিকট গলায় বলে উঠলো, মেরেছিস দান। সাবাস ব্যাটা।

তা এমনি চললো। গোপাল বলতেও পারছে না যে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মদন বিষয়ীর দোকান বন্ধ হয়ে গেলে পাটের গুছি কেনা হবে না। মেলা

দড়ি পাকাতে হবে কাল। কিন্তু নিমাই ঘোষ খেলে যাচ্ছে, কিছু বলাও যায় না। গোপালকে খাটতে হচ্ছে না। শুধু দরকার মতো তিনখানা তাস তুলে একটু আড়াল করে পিছনে বসা নিমাইকে একবার করে দেখাচ্ছে।

চ্যাটাই ছাড়া ঘরে আর কোনোও জিনিসপত্তর নেই। দেয়ালে একখানা গণেশের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। খুব বাহারের গণেশ। গায়ে গয়না, নাদা পেটে থাক থাক চর্বি, শুঁড়খানা খণ্ড ৎ-এর মতো বাঁকানো।

কিছুক্ষণ বাদে গোপাল বুঝতে পারলো, নিমাই ঘোষ অশৈলী কাণ্ড ঘটাচ্ছে আজ। আঁজলা আঁজলা পয়সা তুলছে। এত পয়সা জীবনে দেখেনি গোপাল। পাঁচজনের জায়গায় খেলুড়ি বেড়ে সাতজন আটজনে দাঁড়িয়ে গেছে। পয়সা পড়ছেও মেলা।

ওদিকে বিকেল মরে রাত হতে চললো। গোপালের পেটে খিদে ডন-বৈঠক মারছে। হাটের হল্লাচিল্লা বন্ধ হয়ে গেছে। মদন বিষয়ীর দোকানও নিশ্চয়ই ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে এতক্ষণে। সে তাই খুব করুণ চোখে একবার নিমাইয়ের দিকে তাকালো। গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, আজ্ঞে আমার বড় রাত হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা নিমাইয়ের কানেই গেল না। নতুন দানের তাস বাঁটা হচ্ছে। নিমাই জুলজুলে চোখে সেইদিকে চেয়ে। অন্য সব খেলুড়েরা মাঝে মাঝে গোপালের দিকে ভূত-দেখা চোখে চাইছে।

শৈলেন বললো, আজ ভালো লোক জুটিয়ে এনেছো নিমাইদা। আমাদের যে হালিশ বেরিয়ে গেল।

নিমাই খুব হাসলো, অনেক কষ্টে মালটি জোগাড় করেছি। কলির শেষ রে ভাই, এ যুগে এ সব লোক ডজন-ডজন জন্মায় না। তাসটা গুছিয়ে রাখ রে গোপাল, বড্ড ছড়িয়ে পড়েছে।

শুকনো গলায় গোপাল বলে, নিমাইবাবু, জ্যাঠামশাই যে আমায় আজ খড়মপেটা করবে।

সে যদি করে তবে তোর জ্যাঠা হলো পয়লা নম্বরের আহাম্মক। এমন যার

গুণ তাকে হেলাফেলা করতে আছে! ও তুই ভাবিস না। আমি কাল সকালে গিয়ে একখানা গল্প ফাঁদব খন।

বেজার মুখে বসে রইল গোপাল। তার ওই দোষ, সে কারও কথা ফেলতে পারে না।

তবে খেলা বেশীক্ষণ চললো না। অন্য খেলুড়েরা বড্ড হারছে। বুড়ো সতীশ নাগ "না! আজ আর তাস জুটবে না" বলে লাঠি হাতে উঠে পড়লো। কেদার সাপুই "সতেরোটা টাকা চলে গেল" বলে বিদেয় নিলো শুকনো মুখে। ক্রমে আসরটা ফাঁকা হয়ে এল।

নিমাই ঘোষ গায়ের র‍্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললো, আজকের মতো খুব হয়েছে। চল রে গোপাল।

গোপাল হাঁফ ছাড়লো।

রাস্তায় পা দিয়ে দেখলো, হাট একেবারে ফাঁকা। দোকানপাট সব ঝাঁপ ফেলেছে। শীতটা বেশ চেপে পড়েছে এখন। চারদিক কুয়াশায় আবছা। নিমাই ঘোষ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, আজ যা কেরদানি দেখালি বাপ, তোকে আমার বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে। ভাবিসনি, যা টাকা পেয়েছি অর্ধেক তোর। রাতে গিয়ে গুনে গেঁথে নিই, সকালে গিয়ে তোকে দিয়ে আসব।

গোপাল লাজুক গলায় বলে, ও আমার লাগবে না।

কেন রে? পয়সা হলো লক্ষ্মী। তাকে না বলতে নেই।

আজ্ঞে না। জুয়োর পয়সা, তাও আমার কামাই নয়।

নিমাই বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর মাথা নেড়ে বললো, তাই তো রে। এমন না হলে হাতে দান ওঠে?

এত রাতে বাস টাস সব বন্ধ। কি করে বাড়ি ফিরবে ভাবছিলো গোপাল। হাঁটা ধরলে পৌঁছুতে বেশ রাত হবে।

নিমাই ঘোষের বাড়ি ফেরার ভাবনা নেই। ফিরলেও হয়, না ফিরলেও বাড়ির লোক মাথা ঘামাবে না। ফুর্তিবাজ লোক নিমাই, সবাই জানে।

গোপালের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বললো, লোভ-লালচ থাকলে তোর হাতে তাসই উঠত না। কলিযুগে তোর মতো ভালো লোকেরাই কষ্ট পায়। তোর খিদে পায়নি?

খিদের কথায় লজ্জা পায় গোপাল। খিদে শালা তার সবসময়েই পায়। যখন-তখন। সারাদিন এই খিদেটাই তাকে বড্ড জ্বালিয়ে মারে। আর এখন যে খিদেটা চাগিয়ে উঠেছে সেটা যেন বকরাক্ষস।

সে জবাব দেওয়ার আগেই নিমাই বললো, সজনীর দোকানের কষামাংস কখনও খেয়েছিস? একেবারে মোগলাই রান্না। গরম গরম রুটির সঙ্গে ও জিনিস যা লাগে না। চল।

তা গেল গোপাল।

মেছো-হাটা পেরিয়ে গেলে কয়েকটা খোলার ঘর। তাতে খারাপ মেয়ে-মানুষেরা থাকে। রাত বিরেতে সেখানে মদের আওয়াজ হয়, গেলাস আর বোতলের ঠুনঠুন শব্দ ওঠে আর খুব হররা-হাসি-ফুর্তি চলে। এ-দিকটায় গোপাল আসে না পারতপক্ষে। খোলার ঘরগুলোর গায়েই একখানা টিনের দোচালা আছে। একধারে সজনীর হোটেল, অন্য ধারটায় একটা দিশি মদের আখড়া। এত রাতেও এ চত্বরটা একেবারে জম-জমাট। পেঁয়াজ-রসুন-মাংস-রুটি-সেঁকা মদ সব মিলিয়ে গন্ধে বাতাস ম ম করছে। গোপালের একখানা হাত শক্ত পাঞ্জায় চেপে ধরে নিমাই ঘোষ ঢুকে পড়লো।

ভিতরের ব্যবস্থা ভালোই। চ্যাটাই নয়, টেবিল চেয়ার পাতা। অনেক লোক বসে গ্যাঞ্জাম করছে। নিমাই ঘোষ মানী লোক, সে ঢুকতেই সজনী তার ক্যাশবাক্স ছেড়ে উঠে এসে তাড়াতাড়ি কোণের দিকের একটা টেবিল খালি করে দিলো দুটো লোককে উঠিয়ে। তারা উঠতে চাই-ছিলো না। সজনী কড়া গলায় বললো, খেলে তো বাপু দুখানা করে রুটি আর ফ্রি আলুর ঘ্যাঁট, ওতে কি আর তিন ঘণ্টা টেবিল আটকে বসে থাকা যায়? ওই বাইরে হাটের চালার নিচে বসে গুলতানি মারো গে

যাও। ওঠো ওঠো—

ব্যাজার মুখে লোকছুটো উঠে গেল। তাদের ছেড়ে-যাওয়া গরম চেয়ারে বসে ভারী আরাম হলো গোপালের। আর পাশেই নিমাই ঘোষ, মান্নী লোক।

ওরে গোপাল, একটা কথা।

গোপাল তটস্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে বলুন।

বলি কি শুধু মুখে রুটি মাংস কি আর তেমন জমে! একটু ঢুকঢুক করে নিবি নাকি? খিদেটা চাগিয়ে উঠবে। জিবে তার বাড়বে আর কাল সকালে যা একখানা হাগা হবে না দেখিস।

ঢুক ঢুক? বলে গোপাল আতান্তরে পড়ে গেল। জিনিসটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

তবে বুঝতে হলোও না তার। একটা কালোমতো লোক এসে বোতল আর ছুটো গেলাস নামিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে। এ যে মদ তা গোপাল জানে। পাপীতাপীরা খায়। তবে ছুনিয়াতে তাদের সংখ্যাই বেশী।

গেলাসে খানিকটা ঢেলে জল মিশিয়ে এগিয়ে দিয়ে নিমাই বল্লে, নে, একটু গলা ভিজিয়ে নে বাপ, ছুনিয়ার রঙটাই পাল্টে যাবে।

গোপাল সিঁটিয়ে গিয়ে বললো, না না—

ওরে তুই যে ধম্মপুত্তুর তা তো জানি। তবে কি না একটু নরকদর্শনও করে রাখা ভালো। তাতে সব দিকটাই বেশ জানা হয়। একটু খাবি বাপ, ও তো আর নেশা করার জন্য নয়।

মানী লোকের কথা ফেলেই বা কি করে গোপাল। দোনোমোনো করেও খানিকটা খেয়ে নিল।

কেমন রে?

বড্ড ঝাঁঝ।

তবেই না মজা। ম্যান্দামারা জিনিস খেয়ে সুখটা কী বল। একটু ঝাঁঝালো জিনিসও মাঝে মাঝে আত্মারামকে দিতে হয়। বুঝলি! আর একটু খা। এ

জিনিস কম খেলে কষ্ট, বেশী খেলে সুখ।

তা খেলো গোপাল। প্রথমটায় চুকুস চুকুস করে। তারপর ঢুকঢুক করে তারপর ঢক ঢক করে। তারই ফাঁকে অবশ্য গরম রুটি আর মাংস, তার সঙ্গে ইয়া বড় বড় কাঁচা পেঁয়াজও চলে গেল ভেতরে। কেমন লাগলো তা অবশ্য গোপাল ঠিকঠাক কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবে একে-বারে অন্যরকম। আর পাঁচটা দিনের মতো খানাদানা তো নয় এটা। তার জিব পেট সব যেন একসঙ্গে নাচানাচি করছে। ভিতরে কী যেন একটা ঠেলাঠেলি। অনেককাল আগে গাঁয়ের যাত্রায় একটা গান শুনেছিল গোপাল, হাসিতে খেলিতে আসিনি জগতে, এসেছি করিতে মায়ের আরাধনা…

ভুলেই গিয়েছিল। কেন যে গানটা হঠাৎ ছড়াক করে মনে পড়ে গেল! গোপাল গুনগুন করে গাইতে লাগল, হাসিতে খেলিতে আসিনি জগতে …হাসিতে খেলিতে…

নিমাই ঘোষ ঝুঁকে পড়ে বললো, কী গাইছিস একটু গলা ছেড়ে গা বাপ। তোর গলাটি তো বেশ।

গোপাল একটু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে হেঁকেই গাইতে লাগলো, হাসিতে খেলিতে আসিনি জগতে, এসেছি করিতে মায়ের আরাধনা…

নিমাই ঘোষ গলা মিলিয়ে ফেললো, হাসিতে খেলিতে…আহা, কী গান! চোখে জল আসে রে। হাসিতে খেলিতে…

দুজনে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগলো, হাসিতে খেলিতে…হাসিতে খেলিতে …হাসিতে খেলিতে…

গানটা বড্ড পেয়ে বসলো দুজনাকে। এমন পেয়ে বসলো যে, রথতলা ছাড়িয়ে সীতাপুরের চৌহদ্দি যখন পেরোলো তখনও দুজনে মিলে গেয়ে যাচ্ছে, হাসিতে খেলিতে....

শেষ বাস চলে গেছে। হাঁটা ছাড়া গতি নেই। রাস্তা বড় কমও নয়। তবে সে বাবদে নিমাই ঘোষের কোনোওকালেই কোনোও চিন্তা ছিলো না,

আজও নেই। চিন্তা বটে গোপালের। এতক্ষণে খড়ম হাতে জ্যাঠা বার-বাড়িতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষছে। অন্য সব দিনে দোষঘাট করে ফেললে মনে একটা ভয় থাকে গোপালের। এমনকি জ্যাঠার খড়মের আগাম ব্যথাটাও যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে মাথার খুলিতে। আজ সে সব কিছু হচ্ছে না। মনটা দিব্যি হাসি-হাসি রয়েছে। রাতে ফিরতে পারবে কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। ফিরলেও হয়, না ফিরলেও হয়।

কোণাকুণি একটা মাঠ পেরোচ্ছিল দুজনে। কুয়াশামাখা একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। চারদিকটা দেখাচ্ছে বড্ড ভালো।

নিমাই ঘোষ হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে বললো, ওই হচ্ছে সূতো-হাটা। ওখানে আমার একখানা ঠেক আছে। পরেশ দাস দূর সম্পর্কের একটু আত্মীয়ও হয়। আজ রাতটা থাকবি ওখানে? ওর বউ নেই, ভারী সুবিধে। বিছানারও কোনোও ভাবনা নেই। পরেশ দাসের চটের কারবার। বাড়িতে বাণ্ডিল বাণ্ডিল চট। দু খানা পেতে আর দুখানা চাপান দিয়ে শুয়ে পড়লেই হলো।

বলে খুব হাসলো নিমাই।

তা মানী লোক হাসলে ছোটোলোকদেরও হাসতে হয়। নিয়ম। গোপালও হাসলো। আর হাসিটা এমন পেয়ে বসলো তাকে যে আর থামাতে পারলো না। বুজবুজ করে পেট থেকে হাসি উঠে আসছে তো আসছেই। পরেশ দাসের বাড়ির হাতায় যখন দুজনে পৌঁছোলো তখনও হাসছে গোপাল। তবে সূতোহাটা সে ভালোই চেনে। বহুবার এসেছে। এই তো সেদিন সূতোহাটা হয়ে নবাবগঞ্জে গেল পরাণদাদার বিয়েতে।

হ্যারিকেন হাতে কণ্ঠিধারী রোগামতো একটা খেঁকুরে লোক বেরিয়ে এসেই বিকট গলায় বললো, ক্যা! ক্যা র‍্যা! ওঃ, নিমাই বাহাদুর! সঙ্গে ওটি আবার কে?

এই এলুম ভায়া। পথে একটু রাত হয়ে গেল, তোমার সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ নেই বহুকাল।

কেন, এই তো আশ্বিনেই এসে গেছো একবার মনে নেই।

এসেছিলুম বুঝি! তা আশ্বিনে এলে বুঝি অঘ্রাণে আসতে নেই? নিয়ম নাকি?

বেজার মুখে লোকটা বলে, রাত্তিরে থাকবে নাকি? ও সুবিধে হবে না। মদের গন্ধ বড্ড ভুর ভুর করছে।

তোমার আবার অতো ছুঁচিবাই কবে থেকে হলো?

আমার নয়, বাড়ির লোক কি আর পছন্দ করবে হে!

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলে, বাড়ির লোক! তোমার আবার বাড়ির লোক কবে থেকে হলো? ময়না তো একরত্তি মেয়ে—

লোকটা দরজায় আঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ময়নার কথা হচ্ছে না।

তবে আর লোকটা কে? তোমার তো আর বউ নেই।

গলাটা একটু নামিয়ে কথা বলো বাপু। বউ তো ছিলো না জানি, কিন্তু হালে হয়েছে।

অ্যা! বলে নিমাই ঘোষ কিছুক্ষণ আহাম্মকের মতো চুপ করে রইলো। তবে মুখখানা হাঁ।

গোপালেরও চুপ করা উচিত। কিন্তু হাসিটা কিছুতেই বাগ মানছে না। একেবারে যেন কাতুকুতু খেয়ে উঠে আসছে পেট থেকে।

নিমাই ঘোষের মুখে কথা ফুটলো, ও গোপাল শুনছিস?

গোপাল হাসিটা বজায় রেখেই বললো, যে আজ্ঞে।

ঠিক শুনছিস? আমরা খুব মাতাল হয়ে যাইনি তো রে! ও মশাই, এটা নির্ঘস পরেশ দাসের বাড়িই তো! হ্যারিকেনটা একটু ওপরে তোলো তো বাপু, মুখখানা ভালো করে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।

পরেশ ভারী বিরক্ত হয়ে বললো, এতো রাতে থিয়েটার ভালো লাগে না বাপু। বলছি তো, অসুবিধে আছে।

নিমাই ঘোষ হুঁৎ করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললো, বিয়ের কোনোও বয়স নেই ভায়া, আর তোমার তেমন বয়স হয়ওনি। কিন্তু নিমাই ঘোষ যে পাঁচ

গাঁয়ের পোকামাকড়টার অবধি খবর রাখে, সে অবধি টের পেলো না! তোমার পায়ের ধুলো নিতে হয়।

কথাবার্তায় এমন সময়ে একটা বাধা পড়লো। ভিতর বাড়িতে একটা মেয়ে চিল-চেঁচানি চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ। একখানা বাসন আছড়ানোর শব্দ। আর একটা মেয়ে-গলা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো "মর, মর!"

নিমাই ঘোষ ঘাড় নেড়ে বললো, না রে গোপাল, এখানে সুবিধে হবে না। চটের বিছানায় আজ আর শুয়ে কাজ নেই। দোজবরের বউ বড়ো সাঙ্ঘাতিক জিনিস।

তারা ফের সুতোহাটা ছেড়ে হাঁটা ধরলো।

গোপালের নেশাটা খানিক ছুটেছে। বললো, নিমাইবাবু, লোকটা কে বলুন তো!

সে আছে। পাষণ্ড লোক। একসময়ে এক গেলাসের ইয়ার ছিলো। যতদিন বউ বেঁচে ছিলো ততদিন বিশেষ সুবিধে হয়নি। বছর পাঁচেক আগে বউটা মরে ইস্তক একেবারে পাখনা ফেলেছিলো। ফুর্তির বান ডেকে গিয়েছিলো একেবারে। রাতবিরেতে এসে কতবার হানা দিয়েছি। খাতির করতো খুব। আহাম্মক না হলে দু নম্বর বিয়ে কেউ করে? চারদিকে মেয়েমানুষ, ফেলো কড়ি মাখো তেল। তা নয়, ঘরে ফের এক মুষলপর্ব ঢুকিয়ে ফেললো। যাক গে যাক।

পরেশের বাড়ির সদর থেকে বিশ কদম হাঁটতেই একখানা পান-বিড়ির দোকান এতো রাতেও খোলা দেখে দাঁড়িয়ে গেল নিমাই। এতো রাতে গাঁ গঞ্জের দোকানপাট বড়ো একটা খোলা থাকে না। বুড়োমতো একজন লোক লণ্ঠন জ্বেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে কিছু একটা পড়ছে। মাথা-ঢাকা বাঁদুরে টুপি, চোখে চশমা। দোকানখানা বড়ই। একধারে বোধহয় মুদীর দোকান। সেদিকটার দরজা বন্ধ। অন্য ধারে পানের জন্য ছোট্ট চৌখুপী দোকানঘর।

পান খাবি রে গোপাল?

গোপাল কিছু বললো না। তার খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

লোকজনের সাড়া পেয়ে বুড়ো তাকিয়ে তাদের দেখে হেঁড়ে গলায় বলে, কী চাই ?

নিমাই বললো, পান হবে কর্তা ? এতো রাতে দোকান খোলা দেখে ভাবলুম—খোলা তো নাকি ?

না হে। বন্ধই ধরতে পারো। তবে ভিতর-বাড়িতে জায়গা হয় না বলে এখানেই শুতে হয়। ঘুম কি আর আসে। রাতে জেগে জেগে এই একটু পড়ি টড়ি।

কী পড়ছিলেন ?

এ একখানা তীর্থ-মাহাত্ম্য। এ দিকে কোথায় আসা হয়েছিল ?

সীতেপুরের হাটে।

ও জব্বর হাট। যাওয়া হবে কোথায় ?

এ গাঁয়েই রাতটা কাটানোর ইচ্ছে ছিলো। তা সুবিধে হলো না। পরেশ দাস পুরোনো বন্ধু। কিন্তু—

পরেশ দাস! হুঁ! বলে বুড়ো বই রেখে পানের ওপরকার ন্যাকড়ার ঢাকনা খুলে বলে, কী পান ?

মিঠে পাতি। একটায় জর্দা, অন্যটায় মিষ্টি মশলা।

ও মিঠে পাতি টাতি হবে না বাপু। সব ঝাল পান।

তাও চলবে। তা পরেশ দাসের বৃত্তান্তখানা কী ?

মরবে। ডুইয়ে নেবে শ্বশুর। কপালী মণ্ডল কি সোজা লোক! তার মেয়েকে গলায় ঝোলালে, বুঝবে ঠেলা।

আরও যেন কীসব বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো পান সেজে দিলো। সামনেই বাঁশের খুঁটির ওপর তক্তা পাতা। খদ্দের লক্ষ্মীরা বসবেন। নিমাই তাতে জুৎ করে বসে পড়লো। পাশে গোপাল, তক্তাখানা শিশিরে ভিজে সপসপ করছে। তেমনি ঠাণ্ডা। গোপালের ভারী শীত করছিল। পানটা সে খুব শক্ত দাঁতে চিবোতে লাগলো। কিছু একটা করলে শীত

কম লাগে, সে দেখেছে।

পরেশ দাসের বাড়ি বেশী দূরে নয়, রাতটাও নিশুতি। তাই সে-বাড়ি থেকে নানা শব্দ আসছিল। কান্না, চেঁচামেচি। এবার হঠাৎ গুমগুম কয়েকটা কিলের শব্দ হলো। তারপরই ঝড়াৎ করে দরজা খোলার শব্দ। কে যেন চেঁচিয়ে বললো, বেরো, বেরো, যা কোন্ রাত-ভাতারের কাছে যাবি…

তক্তার ওপর দুজনে সিঁটিয়ে বসে। বুড়োটাও কেমন হাঁ হয়ে আছে। দৌড়োতে দৌড়োতে মেয়েটা এল। এই শীতে পরনে শুধু একখানা ময়লা তাঁতের ডুরে শাড়ি, চুল এলোমেলো, চোখে পাগুলে চাউনি, চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে।

ও দাদু! বলে একটা চাপা আর্তনাদ করলো কাছে এসে।

বুড়ো উঠে দরজার খিলটা খুলে দিয়ে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা ফের এঁটে দিলো। তারপর নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বললো, রোজ এই বৃত্তান্ত। সোমত্ত মেয়ে, ঘর থেকে রাতবিরেতে বের করে দিলে কোথা যায় বলো তো! তুমি পরেশের বন্ধু লোক, একটা বিহিত করতে পারো না? রাত জেগে কি আর এমনি বসে থাকি রে বাপু! জানি তো, মেয়েটাকে মাঝরাতে তাড়াবে। আমার হয়েছে বড় জ্বালা।

নিমাই ঘোষ ঠাণ্ডা গলায় বললো, দোকানেই শোয় নাকি?

আর কোথা যাবে? ডালের বস্তার ওপর পড়ে থাকে। ঘুমোয় না, সারা রাতই কাঁদে।

নিমাই ঘোষ বার কয়েক হেঁচকি তুলে পানের পিক ফেলে বোঁটার চুন খানিক চেটে নিয়ে বললো, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

কোন্ কাজটা বাপু?

এই যে দোকানে মেয়েটাকে শুতে দিচ্ছেন এতে, পাঁচটা কথা তো রটতে পারে।

তা কী করবো বলতে পারো?

ভিতর-বাড়িতে চালান দিলেই তো হয়। মেয়ে বা ছেলের বউ-টউ নেই?

তাদের কাছে গচ্ছিত রাখলেই ল্যাটা চুকে যায়।

ও বাবা, তারা সাক্ষাৎ মা মনসা। দয়াধর্ম বলে কিছু আছে নাকি তাদের? আর তুমি যা বললে বাপু সে কথাও ফেলার নয়। রটছেও খুব। মানুষের মুখ তো আস্তাকুঁড়।

মনটাও তাই।

তা কী করবো বলতে পারো?

কর্তার বয়সটা একটু এ ধারে হলে বলতুম বিয়ে করে নিলেই হয়।

বুড়ো জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, ও সব মনে আনাও পাপ।

তবে বলি কি, যা হচ্ছে হোক, আপনি এখন ঝাঁপ এঁটে শুয়ে পড়বেন। দুনিয়ায় কত কী ঘটছে।

তাই তো থাকতুম গো। প্রথম প্রথম গা করতুম না। পরেশ দাসের বিয়ের তো এখনও মাস পোরেনি। বেশীদিনের কথাও নয়। এই হপ্তা দুয়েক আগে মেয়েটাকে প্রথম যেদিন বের করে দিলে সেদিন গোকুল রায়ের বাড়ি উঠেছিলো গিয়ে। তারপর আর একদিন পতিতপাবনের বাড়ি। তো সেখানে নানা কথা ওঠে। বউঝিরা কেউ খুশি নয়। এই হপ্তাখানেক আগে এসে আমার দরজায় হামলে পড়লো। বড্ড বিপদ যাচ্ছে বাবা।

পরেশ দাস জানে?

বুড়ো চোখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো। গলাটা একটু ঝেড়ে বললো, জানে। সে পাষণ্ড বটে, তবে মেয়ের বাপ তো। হাতে পায়ে ধরে বলে, মেয়েটা এসে পড়লে ফেলো না খুড়ো। একটু দেখো। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা রাখা আর ঠিক হবে না। ও ময়না, শুনছিস এ বাবুটি কী বলছে?

ময়না এসে চৌখুপীতে দাঁড়ালো। চুলটা এলো খোঁপায় বেঁধেছে। চোখও মুছেছে। তবে মুখে এখনও থম-ধরা কান্না। একেবারে টলটল করছে। একটু নাড়া খেলেই কান্না চলকে চলকে পড়বে।

বাবুকে চিনিস?

নিমাইকাকা না ?

নিমাই আর একবার পিক ফেলে বলে, মা মরলে বাপ তালুই, কী বলিস ?

রসিকতা ধরতে পারার মতো অবস্থা নয় মেয়েটার। কান্নায় ভাঙা গলায় বললো, কী মার মারছে রোজ ! জীবনে কখনো এতো মার খাইনি···

কাঁদিস না। নিমাই ঘোষের কানে যখন কথাটা উঠেছে তখন হিল্লে একটা হবেই। ছু চারটে দিন একটু সয়ে যা।

মেয়েটা ভরসা পেলো কি না বোঝা গেল না। হ্যারিকেনটা ধোঁয়াচ্ছে বড়, সলতে ঠিকমতো কাটা হয়নি বোধহয়। আলো তেমন ফুটছে না। সেই আলোয় মেয়েটার মুখখানাও দেখা গেল না ভালো করে।

নিমাই ঘোষ উঠে পড়লো, চল রে গোপাল, অনেকটা পথ।

গোপাল সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো। তবে তার মনে হলো, এই ঘটনায় একা নিমাইবাবু নন, তারও কিছু বলার আছে। এমনিতে সে অচেনা লোকের সঙ্গে বিশেষ কথাটথা কয় না। কিন্তু নিমাইবাবু কেমন শান্ত ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় গুছিয়ে কথা বলে! যেন কতকালের চেনা, ছুবেলা দেখা হচ্ছে। এটা দেখে গোপালেরই বড় ইচ্ছে হলো অমনি ধারা সেও কিছু বলে। কিন্তু পোড়া মাথায় কথা আসতে চায় না।

তবে এলো শেষ অবধি। রওনা হতে পা বাড়িয়ে ফিরে এলো গোপাল, শোনো কর্তা, তোমাকে একখানা কথা বলে যাই।

বুড়ো একটু তটস্থ হয়ে বলে, কী কথা ?

যে কাজটা করবে সেটা ভালো করে করবে। যেমন তেমন কোনো কাজ করা মোটেই ঠিক নয়। হ্যারিকেনের পলতেটা ভালো করে কেটো কাল। তেরাবেঁকা কাটা হয়েছে বলেই ধোঁয়াচ্ছে। এই বাঁ দিকটায় একটা কোণা উঠে আছে। বুঝলে ?

বুঝলো কি না কে জানে, তবে বুড়ো আর ময়না ছুজনেই অবাক হয়ে বাক্য হারিয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

আয় রে গোপাল।

যে আজ্ঞে। যেতে গিয়েও ফের ফিরে এলো গোপাল। পকেটে কিছু টাকা আছে। মেয়েটাও দুঃখী। বোধহয় সৎ মায়ের সংসারে খাওয়া জোটে না। টাকাটা বের করে বললো, নাও। কিছু কিনে টিনে খেও। একটা শাড়িও হয়ে যেতে পারে ওর মধ্যেই।

হ্যারিকেনের পলতের কথাটা বলতে পেরে ভারী ভালো লাগছে গোপালের। এতকাল মেনিমুখো হয়ে থাকতো। নিমাইবাবুর সঙ্গে এই মেলামেশাটা বেশ ভালোই হচ্ছে। বুকে যেন বল আসছে তার। খুব বলেছে সে বুড়োটাকে, আচ্ছাসে শুনিয়ে দিয়েছে। তবে একটা কথা তার মাথায় ভালো সাঁদ হচ্ছে না। বুড়োর দোকানে ময়না নামে মেয়েটা গিয়ে হামলে পড়ে বলে দোষটা কোথায় হচ্ছে? লোকে কুকথাই বলছে কেন?

নিমাই ঘোষ যেন তার মনের কথাটা টের পেয়েই বলে উঠলো, ব্যাপারটা বড্ড গণ্ডগোলের বুঝলি গোপাল! রাতে ওই দোকানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না মেয়েটার। বুড়ো লোক সুবিধের নয়।

যে আজ্ঞে। এ ছাড়া সে আর কথা খুঁজে পেল না। তবে সায় দিয়ে গেলেও হয়। নিমাই ঘোষ তো আর বাজে কথার মানুষ নয়।

নিমাই ফের বললো, মাধব পাইক হলো সুতোহাটার মুরুব্বি লোক। তার কাছে দু'চারদিনের মধ্যেই একবার আসতে হবে দেখছি। পরেশের এ কাজটা ভালো হচ্ছে না।

যে আজ্ঞে।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর নিমাই বললো, শীতটা বড্ড জেঁকে পড়েছে রে। একটু হবে নাকি?

কী হবে তা বুঝতে পারলো না গোপাল। তবে সে 'যে আজ্ঞে'টা চালিয়ে দিলো।

র‍্যাপারের তলায়, বোধহয় ট্যাঁকে বা জামার পকেটেই গোঁজা ছিলো বোতলটা। ম্যাজিকওয়ালার মতো পট করে বের করে আনলো নিমাই।

বললো, গেলাস টেলাস তো নেই। সোজা গলায় ঢালতে হবে।

এই বলে বোতল খুলে মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে গোপালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে। শরীরটা গরম হবে।

গোপাল নিলো। বেশ অভ্যেস হয়েছে তার। ঠিক নিমাই ঘোষের মতোই হাঁ করে ঢকঢক শব্দে গিলে ফেললো জিনিসটা।

তারপর যেন চারিদিকটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে লাগলো। এত অন্যরকম যে গোপাল এই দুনিয়া জায়গাটাকে আর চিনতেই পারছিলো না। নিমাই ঘোষ তার কাঁধে হাত রেখে বেশ হেঁকে গাইছে, হাসিতে খেলিতে আসিনি জগতে, এসেছি করিতে মায়ের আরাধনা···

গোপাল গলা মিলিয়ে ফেললো।

এই পর্যন্ত তার মনে আছে। তারপর থেকে কী যে হলো আর কোথায় যে যেতে লাগলো, পা যে কোন্ খানাখন্দে পড়তে লাগলো তার কিছুই জানে না গোপাল।

২

এ বাড়িতে কিন্তু দুটো লোক আছে যাদের কোনোও আদর নেই। বাড়ির বেড়ালটা কুকুরটা অবধি তাদের দুজনের চেয়ে ঢের বেশী আদর পায়। আর আদর বলতেই বা কী? দুবেলা দুমুঠো ভাত আর একটু মিষ্টি কথা। এ হলেই হয়ে যেতো। কিন্তু সেটুকুরও যে এতো আকাল পড়বে একদিন এ কথা বিয়ের আগে ভাবতে পারতো বাসন্তী? কাজ? তা সে গতর না নাড়লে যে ভাত-কাপড় জুটবে না এ কোন্ মেয়ে না শিশুকাল থেকেই বুঝে যায়? বাপের বাড়িতেও গতর বসিয়ে রেখে তার নিস্তার ছিলো না। শ্বশুরঘরে এসে গতর আর একটু নাড়তে হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে কিছু নয় বাসন্তীর। আসল কথা হলো এ বাড়ির লোকগুলো কেমনধারা যেন। সকলেরই যেন সবসময়ে মাথায় নানা বদ মতলব খেলছে। দোষ খুঁজে বের করতে দিনরাত চোখ গোল্লা করে চেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর এখন গা থেকে ভালো করে বুঝি হলুদের দাগ-ও ওঠেনি। এর মধ্যেই বাপ-মা তোলা গালাগাল অবধি হয়ে গেছে। তার বড় এ বাড়ির আরও চারচারটে বউ আছে। তারাও কিছু কম যায় না। দেমাক দেখলে গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় রাগে। আর স্বামী! সেটা যে কী একখানা মানুষ তার কোনোও হিসেবই করতে পারল না বাসন্তী। বিয়ের রাতেই গয়নাগাঁটির হিসেব নিকেষ নিয়েছিল। রোজ রাতে প্রেমালাপের বদলে বাসন্তীর বাপের কতো জমি জিরেত, কতো ধানপান হয় তার নিকেশ করে। লোকটার মাথায় বিষয়-চিন্তা ছাড়া অন্য কোনোও চিন্তা নেই। কার জমি কে নিলো, কতয় নিলো, কোন্টায় কতো ধান হচ্ছে, কী দর যাচ্ছে এখন বাজারে, বাড়িতে কোন্ খরচাটা হঠাৎ বাড়লো এইসব ছাড়া তার আর

কথা নেই। নতুন বিয়ে, তবু বাসন্তী আজকাল বিছানায় গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ভ্যাড়ভ্যাড় শুনতে তার ভালো লাগে না। এ বাড়ির একটা লোককেও তার পছন্দ নয়। সবচেয়ে দু'চোখের বিষ ছিল ওই গোপালটা। স্নানের ঘরে যেদিন আহাম্মকটাকে দেখলো সেদিনই বিষ-বিছুটি লেগে-ছিলো গায়ে। কিন্তু তারপর কদিন ধরে দেখেছে, আসলে এই আহাম্মকটাও তারই মতন ডাঙায় মাছের মতো খাবি খাচ্ছে। এরও গতি নেই।

গোপালের চেয়ে অবশ্য বাসন্তীর অবস্থা ঢের ভালো। বাসন্তী তবু জানে, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। সে নিজে যথেষ্ট রোখা চোখা মেয়েমানুষ, গলায় জোর আছে আর জিবের ধারও খুব। সে এত খারাপ খারাপ কথা জানে যে, এ বাড়ির লোকের বাক্য হড়কে যাবে সে সব শুনলে। তবে প্রথমেই ও সব করতে নেই। নিজের আসল চেহারাটা এখন বাসন্তী ঘোমটার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। তবে তৈরি হচ্ছে। এ বাড়ির কোন্ পুরুষের কী দোষ, কোন্ মেয়েছেলের কোন্ কোন্ আঁতে লাগার মতো জায়গা তা ঘোমটার আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে আর মনে মনে টুকে রাখছে। যেদিন ঘোমটা খসিয়ে জিবে শান দিয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধরবে সেদিন এরা কুটোগাছের মতো উড়ে যাবে। ওই আঁক কষা পরাণও সেদিন বউকে দেখে জুজুবুড়ির মতো ভয় খাবে। তবে আর ক'টা দিন যাক। বাসন্তী এখন পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে ভাব সাব করে এ বাড়ির সব কথাটথা জেনে নিতে লেগেছে। জেনেছেও মেলা। খুব কাজে লাগবে তার।

কিন্তু ওই গোপালটার গতি হবে না। স্নানঘরের ঘটনার কথাটা বলি-বলি করেও পরাণকে বলেনি বাসন্তী। বললে হাবলাটা মার খেয়ে মরতো। কেন বলেনি তার অবশ্য কারণ আছে। হাবলাটার পেট থেকেও যদি কিছু কথা বেরোয়! কিন্তু মুশকিল হলো, এই দূর সম্পর্কের দেওর-টির টিকির নাগাল পাওয়া ভার। দিনরাত চরকি-ঘোরন ঘুরছে ছোঁড়া। এতো কাজ আর কাউকে করতে দেখেনি বাসন্তী। বোকা হওয়ার দণ্ড

দিচ্ছে।

গণেশের বিধবা বোন শিবানী এসে বৃত্তান্ত একদিন বলে গেল চুপি চুপি, ছোঁড়ার বাপের বিঘে দশেক জমি ছিলো, আর মায়ের কিছু গয়না, সব গাপ হয়েছে। জ্যাঠা কাকারা মিলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। তার দিদি মালতী ভয়ে আসতে পারে না গাঁয়ে। যদি বোকা ভাইকে বুদ্ধি দেয় সেই ভয়ে আসতে দেয় না এরা।

গোপালের কপালে কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বাসন্তী। সে নিজেকে গোছাতে তৈরি হচ্ছে। তবে গোপালের সঙ্গে নিজের একটু মিল দেখে সে একটু দুঃখ পায়।

এই পরশু রাত্তিরেই পরাণ যখন ছোটো হিসেবের খাতা নিয়ে বসে কী সব যোগ-বিয়োগ কষছে তখন বাসন্তী হঠাৎ ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো, হ্যাঁ গো, গোপালের যে বিশ বিঘে জমি আর মায়ের পনেরো ভরি সোনা ছিল তার কোনোও ভাগ তুমি পাওনি?

একটু বাড়িয়েই বললো। তাতে আসলটা বুঝতে সুবিধে হয়।

পরাণ এমন আঁতকে উঠলো যেন ভূত দেখেছে, কে বললো ও কথা?

সবাই জানে। গোপন কথা তো আর নয়।

পরাণ বিরক্ত হয়ে বললো, বিশ বিঘে না আরও কিছু। খানিকটা চাষের জমি ছিলো, তা সেটা আছেও।

গোপাল সেটা জানে?

ওই আহম্মক জেনেই বা কি করবে? চাষ বাস করতে পারবে ও? বুঝে শুনে রাখতে পারবে জমি? আমরাই চাষ করি, ওকে খাওয়াই পরাই। নইলে জমি হাতে পেলে কে মাথায় হাত বুলিয়ে কেড়ে নেবে।

চাষ করতে জানে না বুঝি? তবে বাগান করে কি ভাবে?

আহা, বাগান করা আর ক্ষেত করা কি এক হলো? চাষ করা অন্য জিনিস। বীজধান কেনার পয়সা আসবে কোত্থেকে? পোকার বিষ চাই, সার চাই,

মুনীশদের খরচা চাই, সোজা কথা নাকি ? মাথায় তো ওটার গোবর।
আর গয়না ?
গয়না ! সে আর কতো হবে ! দু চার ভরি হতে পারে মেরে কেটে। সেও মালতীর বিয়েতে লেগে গেছে। বরং ঘরের সোনাও কিছু বেরিয়ে গেছে। এ সব আবার তোমার মাথায় ঢোকালো কে ?
বাসন্তী গোপালের হয়ে ওকালতি করছে না। তবে ব্যাপারটা বুঝে নিচ্ছে। এদের অনেক ছিদ্র। সব ছিদ্রের সন্ধান তার জানা চাই।
শীতের ভোরে নতুন বউদের কী চাই ? লেপের ওম আর বরের ওম। তা বাসন্তীর পোড়া কপালে কি আর তা আছে ! পরাণ আদর সোহাগের মানুষ নয়। অনেক রাত অবধি নানা মতলব ভেঁজে শোয়। ঘুমের মধ্যেও মাথায় নানা ফিকির ফন্দি খেলতে থাকে। পাশে নতুন বউ থাকলে কী হয়, আদর সোহাগ করার জন্য বাড়তি যেটুকু তা তো আর আঁক কষে বের করা যায় না।
বাসন্তী তাই ভোর-ভোর উঠে পড়ে।
আজও উঠে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে উঠোনে নামাতে গিয়ে চমকে উঠলো। এখনও কেউ ওঠেনি এ বাড়ির। উঠোনের চারধারে দালান কোঠা। উত্তর দিকটায় একটা ছাপরা-মতো, গোপাল থাকে। তার বারান্দায় কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বাসন্তীর প্রথমটায় চেঁচাতে ইচ্ছে হয়েছিলো। দৃশ্যটা তো ভালো নয়। কিন্তু চেঁচানোর আগে একটু দেখে নেওয়া ভালো মনে করে সে উঠোন পেরিয়ে কাছে এসে দেখল, গোপালই বটে। মরেনি, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। উঠোনের দিকে পা, সিঁড়িতে মাথা।
লক্ষণটা বাসন্তীর অচেনা নয়। তার বাবা ঘোর মাতাল লোক। এ দৃশ্য সে শিশুকাল থেকে বহুবার দেখেছে। কিন্তু গোপাল মদ খাবে, এ কথাটা বিশ্বাস হয় না।
এই, ওঠো, ওঠো। ঠাণ্ডা লাগবে।

বাসন্তী একটু সঙ্কোচের সঙ্গে গোপালকে ঠেলা দিলো। কাজ হলো না। কাজ হলো ঠাণ্ডা জলে। বারান্দার জালা থেকে মাটির সরায় তুলে এনে মুখে চোখে ঝাপটা মারতেই নড়ে উঠে বললো, আঃ!

ওঠো। ঘরে যাও। কেউ দেখলে বিপদ আছে।

গোপাল শোওয়া থেকে অনেক কষ্টে উঠে বসলো। তারপর ভ্যাবলার মতো চেয়ে বললো, অ্যাঁ! কী হয়েছে?

ঘরে চলো তো। ওঠো?

তাড়া দিলো, ভোর হয়ে আসছে। একজন দুজন করে সবাই ঘুম থেকে উঠবে এখন।

গোপালের ওঠবার ইচ্ছে ছিলো না। আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। বাসন্তী অগত্যা তার চুল ধরে টেনে মাথাটা তুলে বললো, ঘরে যাবে কি না! নইলে ফের জল দেবো।

অল্পের জন্য বেঁচে গেল গোপাল। তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা আবজাতে না আবজাতেই বাড়ির বুড়ো কর্তার ঘরের দরজার হুড়কো খোলবার আওয়াজ হলো। সঙ্গে কাশির শব্দ।

বমি করেছো কোথাও? উঠোনে টুঠোনে?

গোপাল ভ্যাবলার মতো চেয়ে বললো, মনে নেই গো। মাথাটা এমন টলছে কেন!

বমি করে থাকলে লোকে দেখতে পাবে। তখন তোমার কপালে কষ্ট আছে কিন্তু।

গোপাল মাথা নেড়ে বলে, কিছু মনে নেই।

এসব গেলার অভ্যেস তাহলে আছে? বাইরে থেকে দেখে তো মনে হয় ভিজে বেড়ালটি।

গোপালের বিছানা বলতে চৌকির ওপর ছেঁড়া শতরঞ্চি আর একখানা চেক কাটা তাঁতের চাদর। শীতের জন্য একখানা তুলোর কম্বল। ঘরে রাজ্যের কাঠকুটো আর হাবিজাবি জিনিস ডাঁই করা। গোপালের জন্য

বরাদ্দ জায়গা এক চিলতে। তবে ভ্যাবলা গোপালের তো বায়নাক্কা নেই, দড়িতে দু একখানা জামাকাপড়, মেটে কলসীতে জল। ব্যস হয়ে গেল। অথচ ভ্যাবলাটা দশ বিঘে জমির মালিক, হয়তো কিছু সোনা-দানারও।

গোপাল তার চৌকিতে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলো।

বাসন্তী বললো, শুচ্ছো যে বড়ো! কাজকম্মোগুলো কে করবে? এক্ষুণি তো গোপাল-গোপাল বলে হাঁকাহাঁকি পড়ে যাবে।

গোপাল শুতে গিয়েও ফের টেনে তুললো নিজেকে, ওঃ, এরকমধারা হবে জানলে নিমাই ঘোষের সঙ্গে জুটতুম নাকি!

কবে থেকে নেশা করছো!

গোপাল মাথা নেড়ে বলে, জীবনে খাইনি কখনও। কাল নিমাইবাবু জোর করে খাওয়ালো যে। মানী লোক তার কথা ফেলতে পারলুম না।

অন্যের বুদ্ধিতে খেয়েছো! বেশ বাপু। বলি নিজের বুদ্ধি কবে গজাবে তোমার? যাও গিয়ে চোখে মুখে কষে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও, ঘাড়ে কানে পিঠে ভালো করে চাপড়ে দিও। পারলে গলায় আঙুল দিয়ে পেটের জিনিস উগড়ে দাও গে। তারপর বাসী পান্তা যা আছে পেট ঠেসে খেয়ে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। নইলে খোঁয়াড়ি ঠিকমতো ভাঙবে না আর বকুনি খেয়ে মরবে।

মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর খাড়া থাকতে চাইছে না গো। লটকে পড়ে যাচ্ছে।

ওরকম হয়। নিমাই ঘোষটা কে বলো তো! ওই গণেশের বোন শিবানীর সঙ্গে যার ভাব?

সে-ই। সাঁতেপুরের হাটে দেখা হয়ে গেল। খুব খাতির করল।

ও তো পাজি লোক শুনেছি।

সে বলে আমি নাকি খুব ভালো লোক।

তুমি! বলে বাসন্তী হেসে ফেললো, ভালো নয়, তুমি হলে হাঁদা গঙ্গারাম।

এখন যাও, কথায় কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে।

গোপাল খুব কষ্ট করে দাঁড়ালো। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে পুকুরঘাটের দিকে গেল। বাসন্তী চারধারটা সতর্ক চোখে দেখে নিয়ে দরজা খুলে সুট করে উঠোনে নেমে গেল।

লোকটা যে কাল রাতে ফেরেনি এটা এ বাড়ির লোক বোধহয় খেয়ালই করেনি। বারো ভূতের বাড়ি, দরকার না পড়লে কে কার খোঁজ করে! তায় আবার গোপাল, সে কিনা চাকরের অধম।

গোপালকে নিয়ে মাথা ঘামানোর আর সময় নেই বাসন্তীর। দরকারও কিছু নেই। ছোঁড়াটা হেনস্থা হবে, তাই যেটুকু না করলে নয় করেছে। বেহাল হতে না হতেই এ সংসার গিলে খাবে বলে হাঁ করে থাকে। বাসন্তীর আর এক দণ্ড সময় নেই হাতে।

এ বাড়ির বুড়োকর্তা হলেন হরিপদ। বাসন্তীর সাক্ষাৎ শ্বশুর। লোকটা ভয়ানক গোমড়ামুখো আর সবসময়ে রাগ-রাগ ভাব। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কেউ কথা কয় না। ভয়ও খায় খুব সবাই। তা ভয় পাওয়ার মতোই লোক। এমন বক্কজলকরা চোখে সর্বদা তাকিয়ে থাকে যে মানুষেব বুক গুড়গুড় করে।

ভিতরকার উঠোন ঝাঁট দিতে এসে তাই দৃশ্যটা দেখে থেমে গেল বাসন্তী। বোকা গোপাল তার দাওয়ায় উবু হয়ে বসা, সামনে শ্বশুরমশাই দাঁড়ানো। গোপাল দু হাতে মাথা চেপে বসে, চোখ নিচুতে, গতিক সুবিধের নয়। বোকাটা ধরা পড়ে গেছে।

পড়ারই কথা। বাসন্তী যা ভেবেছিল তা সত্যি নয়। বাড়িটা বড় বটে লোকও মেলা। কিন্তু ভীড় বলে আর গোপালটা চাকরের অধম বলেই যে তার খোঁজ কেউ রাখবে না এমন নয়। অন্তত বাড়ির বড়কর্তা ঠিকই জানে গোপাল রাতে ফেরেনি। তবু দুজনের কী কথা হচ্ছে তা বাসন্তী দুর থেকে শুনতে পেল না। কারণ বড় কর্তা অর্থাৎ বাঘা শ্বশুরমশাই চাপা গলায় কিছু বলছে। গোপাল একবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লো।

তারপর মাথা নিচু করে ঝুম হয়ে বসে রইলো।

অনেকক্ষণ বাদে রান্নাঘর সেরে বাসন্তী যখন বেরোলো তখন গোপাল গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে।

বাসন্তী কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলো, জ্যাঠা কী বলছিলেন?

গোপাল হতাশভাবে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললো, কিছু বুঝতে পারছি না।

কী বুঝতে পারছো না?

কী যেন সব জমিজমার কথা, গয়নাগাঁটির কথা। আমি তো কিছু বলিনি। তবু বলে, আমি নাকি তোমার কাছে কী সব নালিশ করেছি। রতন মান্নাকে দিয়ে নাকি আমাকে খুন করিয়ে মোল্লাদহের পাঁকে পুঁতবে। তোমাকেও।

বাসন্তী ঠিক ফুঁসে উঠতে পারলো না। কেমন যেন হাত পা একটু শির-শির করল তার।

রতন মান্নাটা কে?

ও বাবা, নাম শোনোনি? টাকা নিয়ে মানুষ মারে। মেলা মেরেছে। মাসটাক আগে হরিপদ মণ্ডলকে মারলো মনে নেই? দা-এর এক কোপে ঘাড় নামিয়ে দিলো রথতলায়। একেবারে দিনেদুপুরে।

পরে কথা হবে। এখন যাও। চারিদিকে লোক নজর রাখছে।

যেতে গিয়েও গোপাল ফিরে এসে বললো, পাটের গুছি কিনতে টাকা দিয়েছিল জ্যাঠামশাই। সেটাও পাচ্ছি না।

বাসন্তীর বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। শ্বশুর কেমন মানুষ তা সে খুব ভালো জানে না। শুধু শ্বশুর কেন এ বাড়ির লোকজন সম্পর্কেও তার এখনও তেমন বুঝ সমঝ হয়নি। বরের কাছে গোপালের জমিজমার কথাটা তোলা কি ভুল হলো? ওই বিষয়ী লোকটা তার বাপের কাছে বউয়ের নামে লাগিয়েছে। আজকাল চারদিকে বউ খুন হয়, সে শুনেছে। মেরে পুড়িয়ে ফেললে কে কী করবে?

বুকের ঢিপ ঢিপ নিয়েই বাসন্তী সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল বটে, কিন্তু হাতে পায়ে যেন জোর বল নেই। সে নতুন বউ, অচেনা শ্বশুর-বাড়িকে আজ তার শত্রুপুরী বলে মনে হচ্ছিল।

গেরুস্থবাড়িতে কাজের অন্ত নেই। কাজ করতে করতে একসময়ে বুকের বিচ্ছিরি ধুকপুকুনিটা থামল। মাথাটাও একটু পরিষ্কার হলো। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা একা ঘরে সে ভাবতে বসলো। গাঁ-গঞ্জ বলে কথা। এখানে সে আজ খুন হলে বাপের বাড়িতে খবর যাবে সাত দিন বাদে। তার মাতাল বাপ হয়তো গ্রাহ্যও করবে না। আর মা তো মেয়েমানুষ, কী বলবে? এদের মেলা টাকা, লোক-লস্কর। তাহলে কি পালাবে বাসন্তী? সেটাও সোজা কাজ নয়। ধরা পড়ার ভয়। আর নিজের গাঁয়ের রাস্তাও কি সে চিনবে?

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে এক পুকুর জল বুক থেকে উগড়ে চোখ দিয়ে ঝরিয়ে দিলো বাসন্তী। তাতে অবশ্য বুক হালকা হলো না।

জানলায় কে একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে। টের পেয়েই বাসন্তী ভারী শিউরে উঠে চেয়ে দেখে, শিবানী। গণেশের বিধবা বোন।

কাঁদছিলে নাকি? বাপের বাড়ির কথা ভেবে? দেখ কাণ্ড, এখন তো প্রায় পুরোনো বউই হয়ে গেছ, এখনও কাঁদতে আছে। বাপের বাড়ির কী সুখ তা তো বিধবা হয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

বাসন্তী উঠে দরজা খুলে দিলো।

এসো। কথা আছে।

কথা রোজই থাকে। মেয়েমানুষের যদি কথার শেষ থাকত তাহলে দুনিয়াটা চলতো কিসে?

দরজাটা ফের সাবধানে এঁটে দিয়ে এসে বসল দুজনে বিছানায়।

বাসন্তী চাপা গলায় বলে, এরা সত্যিই কেমন লোক বলো তো ভাই। আমার বড় ভয় করছে। গোপালের জমিজমার কথা তুলেছিলাম আমার বরের কাছে। সেটা শ্বশুরের কানে গেছে। শ্বশুর গোপালকে বলেছে

রতন মান্নাকে দিয়ে আমাদের খুন করাবে।

শিবানী একটু অবাক হয়ে বলে, খুন করবে কেন?

গোপালের সঙ্গে আমি ষড় করছি বলে ভেবেছে।

শিবানী এবারে গম্ভীর হলো। তারপর বলল, অত ভাবছো কেন? রতন মান্না খুনে বটে, আর এদের পেয়ারের লোকও। দাঁড়াও, নিমাইদাকে বলে দেখি।

আমার বড্ড ভয় হয়েছে আজ। চারদিকে যা বউ-মারা হচ্ছে।

মেয়েমানুষের মরণ কি আর একরকম। মরেও মরে, বেঁচে থেকেও মরে।

বাসন্তীর ফের চোখে জল এল, এমন জানলে কে বিয়ে করত বলো।

কেঁদো না। তুমি তো নতুন বউ। সংসারের বিষ এখনও টের পাওনি।

খুব পাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে তো বাসরঘরেও অঙ্কের মাস্টার। রোজ রাতে ছোটো একটা খাতা খুলে বসে কেবল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করছে।

পরাণদা বরাবর ওইরকম। আনন্দ নেই, ফূর্তি নেই, বেড়ানো ফেড়ানো নেই। কেবল জমিজিরেত আর টাকা পয়সার চিন্তা। এখনই কি, আরও টের পাবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছো ভগবান কি অল্পে ছাড়বে ভেবেছো?

বাসন্তী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, গোপাল রাতে মদ খেয়ে এসেছিল।

শিবানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, জানি।

কি করে জানলে?

নিমাইদার পাল্লায় পড়েছিল কাল। ওই তো লোকটার দোষ। নিজে নেশা করবে, আরও পাঁচজনকে নেশা ধরাবে। এ ছাড়া অমন ভালো আর পরোপকারী লোক পাবে না। কপালদোষে মদ খায়। তা সে তোমার ওই গুণধর স্বামী পরাণচন্দরও খায়।

খায়? কই কখনও গন্ধ পাইনি তো।

পাবে। তাড়া কিসর? বিয়ের নেশাটা আছে বলে ক'দিন খাচ্ছে না।

নেশা ছুটলো বলে। তখন খাবে। তোমার শ্বশুর রোজ বিকেলে গয়লা-পাড়ায় গিয়ে তাড়ি গিলে আসে, টের পাও না ? আজকাল বারো আনা লোকেরই ওসব দোষ আছে। তবে তারা নেশাও করে, আবার লোকও খারাপ। নিমাই ঘোষ ওদের মতো নয়। নেশা করলেও তার মন খুব পরিষ্কার।

গোপালের যা হয় হোক, ও নিয়ে ভাবছি না। কিন্তু শ্বশুরের যে আমার ওপরেও কোপদৃষ্টি পড়লো তাইতেই ভয় পাচ্ছি।

ভয় পাওয়ার কথাও একটু। তোমার শ্বশুর খুব সোজা লোক তো নয়। রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

কিন্তু আমার দোষটা কী বলো।

দোষ ওইটেই। গোপালের হয়ে কথা বলেছো যে। আর নিজেদের কীর্তি কাহিনী ফাঁস তো হয়ে গেল।

তুমি না বললে কি আমি ওসব জানতে পারতুম, বলো। আমি অবশ্য তোমার নাম বলিনি।

শিবানী হঠাৎ একটু রাগের গলায় বললো, বলে কি দোষ করেছি ? দুজন মেয়ে মানুষের দেখা হলে ভালোমন্দ অনেক কথাই হয়। তাই বলে কি সে কথা পাঁচজনের কাছে গেয়ে বেড়াতে আছে ? আমার ঘাড়ে দোষ চালান দিওনা বাপু, আমি কিছু জানি না।

বাসন্তী ভারী অসহায় হয়ে বললো, রাগ করছো কেন ? আমার কেমন বিপদ যাচ্ছে !

তোমার মতো লোকের বিপদ হবে না তো কী ? স্বামী তো ফিরেও চায় না, তবু তার কান ভারী করে আদিখ্যেতা করতে গেলে কেন ? বলছো বটে আমার নাম বলোনি, কিন্তু ঠিক জানি তাও বলেছো। তোমার মতো লোককে আমার বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছিল।

অন্য সময়ে হলে বাসন্তী তার ছাড়ত না। ঝেড়ে কাপড় পরাত। এখন শুধু কাঁদলো।

কান্না দেখে ভিজবার মেয়ে বিশানী নয়। কান্না সে বিস্তর দেখেছে। তারও একটা জন্ম তো চোখের জল ফেলে ফেলেই কাটছে। বরং কান্না দেখলে সে খুশিই হয়। তার বুকটা যেমন সারাদিন জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে তেমন অন্যেরও হোক। বুক শুকিয়ে জ্বলেপুড়ে আংরা হোক।

এ মেয়েটার কান্না দেখে না ভিজবার আরও একটা কারণ আছে শিবানীর। নতুন বউ এলে এখন যে ন্যাতানো ভাবটা আছে সেটা কিছু নয়, মেয়েটার ভিতরে বিড়ে পাকিয়ে একখানা সাপ এখম ঘুমোচ্ছে। নতুনের গন্ধ যখন গা থেকে উবে যাবে, একটু যখন ঝুনো হবে এ সংসারে থেকে তখন সাপটা আড়মোড়া দিয়ে উঠে ফণা ধরবে। তার বিষে জ্বলেপুড়ে যাবে, সংসার। গলার তারসে কাক-চিল বসতে পারবে না বাড়িতে। মেয়েটাকে নেড়ে ঘেঁটে বুঝে গেছে শিবানী। সে লোক চেনে। বাসন্তী যত চোখের জলে ভাসছে তার চেয়ে ঢের বেশী অন্যদের ভাসাবে।

শিবানী চোখ মুছে ধরা গলায় বললো, তোমার কুচ্ছো গাইনি গো বিশ্বাস করো।

বাসন্তী একটু কড়া গলায় বলে, পরাণদার কাছে যদি আমার নামে লাগিয়ে থাকো, যদি বলে থাকো যে, গোপালের জমিজমার কথা আমিই তোমাকে বলেছি তা হলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমার করবে কচুপোড়া। তবে যেটা হবে তা হলো, আমার যাওয়া-আসা বন্ধ হবে। মাঝে মধ্যে তোমার কাছে আসতুম, তা আর আসা হবে না।

বিশ্বাস করো, তোমার নাম বলিনি। কালীর দিব্যি, মায়ের দিবা, আমার দু চোখের দিব্যি, মা শীতলার দিব্যি।

শিবানী দিব্যির বহর দেখে নরম হলো। বললো, ঠিক আছে, বিশ্বাস করলুম। নিমাইদা এলে বলবো'খন তোমার কথা।

৩

সেই থেকে মাথার মধ্যে যেন একটা টিকটিকি সেঁদিয়ে আছে। কেবল টিকটিক করে নানা কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। জমিজমার কথা গোপালের মনেও ছিলো না, ভাবেওনি কখনোও। দিদি মালতী মাঝে মাঝে বলতো বটে, আমরা তো আর এ সংসারে মাগনা খাচ্ছি না। আমাদের অনেক জমি। মায়ের গয়নাও ছিলো।

গোপালও ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিষয় সম্পত্তির অনেক হ্যাপা, তা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল। সে যেমন আছে তেমনি থাকলেই হয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়ার সময়টায় এক বেড়াল ছাড়া তার কাছাকাছি আর কেউ থাকে না বড একটা। রান্নাঘরের দাওয়ায় বউদের কেউ ভাত বেড়ে দেয়, সেটা গামছা চাপা হয়ে পড়ে থাকে। কাজ-টাজ সেরে গোপাল যখন দুপুরের খাবার খেতে বসে তখন বাড়ির মেয়েরা যে যার ঘরে জিরোচ্ছে, সূয্যিঠাকুর পশ্চিমে বেশ ঢলে গেছেন। এ-বাড়ির পাঁচটা ছোটো বড় বেড়াল শুধু খবর রাখে। তারা এসে থুপ থুপ হয়ে ঘিরে বসে থাকে। বেড়ালদের জন্য একটু ফেলে ছড়িয়ে খেতে হয় তাকে। সে খায়, বেড়ালে-রাও খায়।

আজ দৃশ্যটা একটু অন্যরকম। সে বসেছে মেঝেয় উবু হয়ে, যেমনটা রোজ বসে। সামনে একটা জলচৌকিতে জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে জ্যাঠাইমার একটা তফাৎ টের পায় গোপাল। জ্যাঠামশাইয়ের বেশী কথা শোনা যায় না, মুখের বদলে কথা কয় তার বাঘা চোখ। আর জ্যাঠাইমার মুখে সর্বদা মিষ্টি কথা। কে বেশী ভয়ের তা বোকা মাথায় ঠিক বুঝে

উঠতে পারে না গোপাল।

তুই তো মদ ধরেছিস শুনলুম বাছা, তবে বাকী আর কী রইলো বল। এইটুকু বেলা থেকে বুক বুক করে মানুষ করেছি। তোর অধঃপাত দেখলে আমি কোথায় গিয়ে মুখ লুকোবো!

আজ যে খাওয়াটা মাটি তা গোপাল বুঝে গেছে। গরাস নাড়াচাড়া করছে। কোন্ কথার কী জবাব হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে তার।

জ্যাঠাইমার গায়ে একখানা হলদে রঙের খদ্দরের চাদর। নকশাদার কটকী পাড়। আড়চোখে সেদিকটা দেখছে গোপাল আর গরাস নাচাচ্ছে। জ্যাঠাইমার চোখের দিকে চাওয়ার সাহস পাচ্ছে না।

তোর অভাবটা কিসের বলবি? দুবেলা পেটপুরে খাওয়া, জামাকাপড়, জুতো, মাথার তেল, বিছানা, এমন কি আস্ত একখানা ঘর অবধি। মাসে তোর পেছনে কত টাকা যায় তার হিসেব রাখিস? তা না হয় হলো, আপনজন, ফ্যালনা তো আর নয়। খরচ হচ্ছে হোক। কিন্তু তা বলে পরাণের বউয়ের কাছে দুঃখের কথা বলতে গেলি কোন্ মুখে? নতুন বউ, আমাদের কী ভাবলো বল দেখি!

গোপাল ভয়ে রা কাড়লো না। তার কোন্ কথার কোন্ মানে হয় কে জানে বাবা।

জ্যাঠাইমার গলার স্বরে আজ দুঃখ ঝরে পড়ছে, কপালের দোষ ছাড়া আর দুষবো কাকে বল। পরাণের বউটা আনলুম বেছেগুছে, কপালের ফেরে সেটাও হয়ে দাঁড়ালো খাণ্ডার। সেদিন রাত্তিরে তো পরাণকে উস্তম-কুস্তম করে ছেড়েছে। কোন্ কাকের মুখে কথা ছড়াচ্ছে কে জানে, গোপালের নাকি বিশ বিঘে জমি, পঞ্চাশ ভরি সোনা ছিলো। তা বলি বাপু, তোর এত দরদ কিসের? গোপাল বয়েসের ছেলে, তুইও সোমত্থ মেয়ে, অত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর তো ভালো নয়। ঘি আর আগুন বলে কথা। তবে গোপালকে আমি জানি। আমার কোলেই তো মানুষ হয়েছে। তার বাপু মনে পাপ নেই। তা আবাগীর বেটি যদি সর্বদা নজর

দেয় তা হলে গোপালের দোষ কী?

গোপাল হাতের গরাসটা একটা বেড়ালকে খাইয়ে দিলো। আজ তার পাতে দু'খানা মাছ। এক খাবলা আচার। অন্যান্য ব্যঞ্জনও আছে। মনে হচ্ছে, তাকে একটু খাতির করা হচ্ছে।

জ্যাঠাইমা গলাটা আর এক পর্দা খাটো করে বলে, পেট থেকে অনেক কথা বের করার চেষ্টা করবে বাবা। ও মেয়েমানুষ বড্ড ফঁাহাবাজ, তুই আবার ঢলে পড়িস নে যেন। পরাণের কানে যদি এসব কথা যায় তাহলে রক্ষে রাখবে ভেবেছিস? কোথায় দেখা টেখা হয় তোদের? রাতবিরেতে এসে হাজির হয় নাকি?

গোপাল মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না গো জেঠি, দেখা সাক্ষাৎ কখনোও হয় না। কিছু কথাবার্তাও হয় নি।

তবে আবাগীর বেটি তোর জমিজমার কথা তুলছে কেন? কানটা ভাঙাচ্ছে কে?

তার আমি কি জানি বলো। আমি কিছু জানি না।

কথাটা জ্যাঠাইমার বিশ্বাস হলো না। শুধু বললো, বউয়ের ব্যবস্থা করছি। ভূত কী করে ঝাড়তে হয় তা জানি। তুই ভাবিসনি। পেট ভরে খা।

জ্যাঠাইমা চলে যাওয়ার পর গোপাল কয়েক গ্রাস ভাত খেতে পারলো। কিন্তু কেমন যেন জিবে আজ স্বাদ পাচ্ছে না সে। অথচ তার জিব এমন যে কাঁচা তেঁতুল থেকে শুরু করে ভাতের ফ্যান অবধি স্বাদ পায়।

ভোজটা আজ বারো আনাই বেড়ালদের পেটে গেল। গোপাল ঘটি দেড়েক জল খেয়ে পেটের মধ্যে ঢকঢক শব্দ নিয়ে উঠে পড়ে।

ঘটনাটা কী ঘটেছে তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না গোপাল। তবে তাকে আর বাসন্তী বউঠানকে যে এক বল্লমে গাঁথবার চেষ্টা করা হচ্ছে শুধু সেটুকুই বুঝতে পারছে সে।

গোবিন্দপুরের মাঠে ঘাস কাটতে এসে গোপাল জামগাছের ছায়ায় বসে মাথাটা ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলো—এই একটা

জায়গা তার ভারী নিরেট। সেটা হলো তার মাথা।

মাথা খাটানোর ধকলেই বোধহয় একটু ঘুম এসে গেল তার। আচমকা ঢলে পড়লো জামতলায়। একেবারে নিঃসাড় চাষাড়ে ঘুম। যখন চোখ মেললো তখন দিন ফৌত হয়েছে। সূয্যিঠাকুর একেবারে বাবলা ঝোপের আড়ালে নেমে পড়েছেন।

সব কাজেই আজ বড্ড ভুলভাল হচ্ছে। হাত পা কিছুই যেন ঠিকমতো চলছে না। শরীরটাও বশে নেই। মাতলামিটা কি এখনও থাবা গেড়ে আছে নাকি ভেতরে? কথাটা একবার নিমাইবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এরকম চললে কপালে লাথি-ঝাঁটা আছে।

লাথিটা অবশ্য একটু বাদেই খেলো গোপাল। গোয়ালের কাজ সেরে গরু বেঁধে যখন জাবনা মাখছে ঠিক সেই সময়ে ক্যাঁত করে লাথিটা এসে লাগলো তার কোকসায়। উপুড় হয়ে গামলার মধ্যে পড়ে গিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠতেই আর একটা। একটা খুঁটিতে পড়ে কপালটা থেঁতলে গেল। চোখে অন্ধকার, কানে ভোঁ। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থেকে কেঁতরে উঠলো সে। চেয়ে দেখলো, সামনে পরাণদাদা।

পাটের গুছির টাকা বেচে মদ খেয়েছিস?

গোপালের মাথাটা বড্ড টনটন করছে। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। মাথার রক্তে হাতটা ভেজা। মাথা নেড়ে বলে, না।

তা হলে টাকা গেল কোথায়? অতগুলো টাকা!

গোপাল কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারলো না। টাকাটা কোথায় গেল, তা ভালো মনে পড়ছে না। লাথি খেয়ে মাথাটা আরও ঘুলিয়ে গেছে।

পরাণ পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাচ্ছে, শুয়োরের বাচ্চা, জোচ্চোর কোথা-কার, আবার লোকের কাছে নাকি কান্না কাঁদা হচ্ছে আজকাল! আমার জমিদারী ছিলো, মায়ের একশো ভরি সোনার গয়না ছিলো, আর কীকী ছিলো তোর বল কুত্তা।

বলে পরান ফের গোপালের চুলের মুঠি চেপে ধরলো।

ঘোঁট পাকাচ্ছো অ্যাঁ! ঘোঁট পাকানো হচ্ছে! জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো, বুঝলি শুয়োরের বাচ্চা? জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। টাকা যদি বের করতে না পারিস তা হলে রাত পোয়াবে না তোর।

গোপাল বুঝেছে। এসব কথা সে জলের মতো বুঝতে পারে। দু চার ঘা আরও পড়লো। গালে থাপ্পড় আর একটা শেষ লাথি। তবে রক্ষে এই পরাণদাদা রাগী মানুষ হলেও তেমন জোরালো মানুষ নয়। প্রথম দুটো লাথির পর এগুলো তেমন টেরই পেলো না গোপাল।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ চেঁচালো পরাণ। পরাণদাদা হচ্ছে টাকার লোক। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় তার কাছে আর কিছু নেই। পাটের গুছির টাকাটার জন্য বড্ড দাপাচ্ছে। জল আরও গড়াবে। টাকা চোট হলে পরাণদাদা আর মানুষ থাকে না। গোপাল জাবনার মাটির গামলাটা ধরে মাথা নুইয়ে দম নিলো কিছুক্ষণ। লক্ষ্য করলো, পরাণদার ঘরে সাঁঝবেলাতেও আলো নেই।

কপাল অনেকটা কেটেছে। গাঁদা পাতা ডলে লাগালো গোপাল। তার-পর গরুর জাবনা দিলো। যা যা কাজ ছিলো সব করে গেল ঘোরের মধ্যে। ভাগ্য ভালো, কাজ করতে মাথা খাটানোর দরকার হয় না। রোজকার কাজ, হাত পা আপনা থেকেই করে যায়।

পরাণদার চেঁচামেচি লাফালাফি বন্ধ হওয়ার পর বাড়িটা থমথম করছে। লোকজন শব্দ করে হাঁটছে না, বাচ্চাদের হাল্লাগুল্লা নেই, কথাবার্তা সব ফিসফাস করে হচ্ছে মনে হয়।

কপালটা ফুলে ঢোল হলো রাতের দিকে। মাথার যন্ত্রণাও খুব। রাতেও তেমন খেতে পারলো না গোপাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো মাঝরাতে। তার ঘরের দরজায় আগড় নেই তেমন। একটা আঁড় বাঁশ আছে বটে ঠেকনো হিসেবে। তা সেটা বাইরে থেকে দরজার ফুটো দিয়ে হাত বাড়িয়েই খোলা যায়। দরজা খুলে মাঝরাতে তার ঘরের মধ্যে একটা মেয়েমানুষ ঢুকেছে দেখে আতঙ্কে গোপাল কাঠ হয়ে গেল।

ভয় পেও না, আমি বাসন্তী।

গোপাল সিঁটিয়ে গিয়ে বললো, সেইটেই তো ভয়ের কথা। পরাণদাদা টের পেলে—

সে বাড়ি নেই। বউ ঠেঙিয়ে ভাই ঠেঙিয়ে বীরের মতো নকিবপুরে বলাই সামন্তর বাড়ি গেছে। সেখানে যাত্রা আছে।

তোমাকেও ঠেঙিয়েছে ?

আলো থাকলে দেখতে পেতে সারা শরীরে কালশিটের দাগ। দরজার ডাশা খুলে তাই দিয়ে চ্যাঙাব্যাঙা করে মেরেছে। চুল কতো ছিঁড়ে নিয়েছে জানো ? শাঁখা চুড়ি কিছু আস্ত নেই।

গোপাল উঠে বসলো। গম্ভীর হয়ে বললো, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি পরাণদাদার। মোটেই ভালো হয়নি কাজটা।

পৃথিবীর বেশির ভাগ বিষয় সম্পর্কেই গোপালের কোনোও নিজস্ব মতামত নেই। মতামত সে দেয়ও না। কাল মদের ঘোরে সেই বুড়োটাকে হ্যারিকেনের পলতে কাটার কথাটা খুব যুৎমতো বলেছিলো। আর আজ এই।

বাসন্তী বিছানায় বসে পড়লো দেখে একটু আতঙ্কিত হলো গোপাল। কী সব যেন খারাপ খারাপ সব কথা বলছিলো জ্যাঠাইমা। রাতবিরেতে আসে কিনা, সোমত্থ বউ, আর বয়সের ছেলে। বউঠানের এই নিশুত-রাতের আসাটা কি ঠিক হয়েছে ?

অন্ধকারে একটু ফোঁপানির শব্দ হলো। ধরা গলায় বাসন্তী বললো, মেরেই ফেলতে চায়, বুঝেছো ?

গোপাল ঘাড় নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, মাম্মাকে খবর দেওয়ার কথা। মেয়েমানুষকে মারতে আর কী লাগে বলো। অজ গাঁয়ে মেরে পুড়িয়ে ফেললে কে আর খোঁজ নিতে আসছে।

তা বটে।

একটা কাজ করবে ? আমাকে বাপের বাড়িতে রেখে আসবে ? অতটাও করতে হবে না। রাত থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি চলো। বাস রাস্তায়

পৌঁছে যদি দাও তা হলে আমি ঠিক চলে যেতে পারবো। আমি আজ পালাবো বলেই ঠিক করেছি। কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলবো, ভয়ে তোমাকে জাগালুম। নবাবগঞ্জের বাস কোথা থেকে ধরতে হয় জানো!

গোপাল আনমনে বললো, সে সেই সুতোহাটা। এখান থেকে নবাবগঞ্জের বাস নেই।

কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলো না গোপাল। সে ভাবতে লাগলো।

তুমিই বা কোন্ দুঃখে এখানে পড়ে আছো বলো তো! গতর আছে, খাটলে অনেক রোজগার করতে পারবে।

গোপাল অন্ধকারে মাথা নেড়ে সায় দিলো। বাসন্তী সেটা দেখতে পেলো না অবশ্য।

চুপ করে আছো কেন? ভয় করছে?

গোপাল একটা শ্বাস ফেলে বলে, খুব গণ্ডগোল হবে যে গো!

তুমি যদি সঙ্গে না যাও তবে আমাকে একাই যেতে হয়। তোমার ধর্মে সইলে তাই হবে। সুতোহাটা না কী যেন বললে জায়গাটার নাম।

সুতোহাটা নামটা কেমন যেন সাইকেলের বেল-এর মতো ক্রিং করে উঠলো মাথায়। গোপাল মাথা ঝাঁকালো। ফের সেই ক্রিং। সুতোহাটা নামটার সঙ্গে যেন কী একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে!

পট করে মনে পড়ে গেল গোপালের। সেই দোকান আর ময়না। বটেই তো, সে পাটের গুছির পুরো টাকাটাই তো ময়নাকে দানখয়রাত করে এসেছে। মদের ঘোরে করেছিলো, টাকাটা উসুল করে আনতে হবে। নইলে পরাণদাদা বা জ্যাঠা রক্ষে রাখবে না।

গোপাল তেড়েফুঁড়ে হঠাৎ উঠে পড়লো, নাঃ, চলো তোমাকে এগিয়েই দিয়ে আসি। হাঁটতে হবে কিন্তু অনেকটা।

পারবো। প্রাণের ভয় বড়ো ভয়। রাত দুটো কিন্তু বাজে, আর দেরী করো না।

নাঃ, দেরী কিসের ? বলে গোপাল তুলোর কম্বলটাই গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লো।

বড়ো ঘরের দাওয়ায় দিশি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিলো। ভুক ভুক করে দুটো আওয়াজ দিলো মাত্র। চিনতে পেরে ফের ঘুমোলো।

উঠোনটা বড্ড সাদা আর ফাঁকা। ওদিকটায় গেলো না দুজন। ডানধারে কচুবনের মধ্যে নেমে ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়লো। পতিত জমি পেরিয়ে রাস্তায় উঠে গোপাল দেখলো, বাসন্তী একটু খোঁড়াচ্ছে।

খোঁড়াচ্ছো যে ! পারবে হাঁটতে ?

বড্ড লেগেছে গোড়ালির হাড়ে। ফুলে আছে জায়গাটা। সারা গায়েই বিষের ব্যথা গো। শরীরের জোরে কি পারছি, হাঁটছি তো মনের জোরে গা ভর্তি জ্বরও আমার। কপালে হাত দিয়ে দেখ ! `

দেখলো গোপাল। কপালটা সত্যিই গনগনে।

তা হলে কী করবে গো !

যাবো। চলো, ঠিক পারবো।

দু'জনে মাঠে নেমে পড়লো। কোণাকুণি গেলে রাস্তা কিছু কম পড়বে। ফিকে একটু জ্যোৎসনার মতো আছে। আর মাঠঘাটও গোপালের বেজায় চেনা।

গোপাল তুমি বড্ড ভালো লোক।

গোপাল সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিলো। কাল নিমাইবাবুও কথাটা বলছিলো বটে। মানী লোকের কথা তো আর ফ্যালনা নয়।

এদের সাংসারে কেন যে পড়ে আছো তুমি ! পালিয়ে যেতে পারো না ?

গোপাল একটু বুক চিতিয়ে বললো, আমার কাজের অভাব নেই, বুঝলে ! কত লোক ডাকাডাকি করছে।

তা হলে যাও না কেন ?

জ্যাঠাইমা বড্ড দুঃখ পায় যে।

ছাই পায়। তোমার মতো বিনিমাগনার মুনীশ আর কোথায় পাবে, তাই

কুমীরের কান্না কাঁদে। ওসব ধরো না। পালাও।

কী জানো, এ জায়গায় কেমন যেন বশ হয়ে গেছি। নতুন জায়গায় গেলে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে কথাটথা কইতে হবে, আমি বোকা তো, ভালো পেরে উঠিনে।

নতুন মানুষকে ভয় কি? কাজের লোককে সবাই খাতির করে।

গোপাল ফের ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

শোনো গোপাল, তোমার কিন্তু সত্যিই জমিজমা ছিলো। গয়নাও। তোমাকে ঠকিয়ে ওরা সব নিয়ে নিয়েছে।

গোপাল উদাস ভাবে বললো, হবে। তা আর কী করা?

তুমি যদি গাঁয়ের মুরুব্বিদের কাছে যাও তাহলে হিল্লে হতে পারে।

গোপাল মাথা নেড়ে বললো, ও হবে না।

কেন হবে না?

জ্যাঠাও তো মুরুব্বি। আর যারা আছে তারাও সব জ্যাঠার মতোই। কেমন যেন গোমরামুখো, বাঘের মতো সব চোখ। আমি পেরে উঠবো না।

তা বলে পড়ে পড়ে মার খাবে?

খুব একটা লাগে না।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না গোপাল। কেমনধারা মানুষ তুমি!

এই যে বললে ভালো!

ভালোই তো। বড্ড বেশী ভালো। তবে ভীষণ ভীতু।

ভয়ে পালাচ্ছে কে? আমি না তুমি?

আমার কথাটা আলাদা। তোমার মতো পড়ে পড়ে মার খাইনি।

গোপাল কথাটা ভাবলো। খানিকক্ষণ ভেবে বললো, হরিদাদা বা পরাণ-দাদার মারে তেমন জোর নেই। তবে জ্যাঠা যখন খড়ম দিয়ে বা গাঁট-ওয়ালা লাঠিটা দিয়ে পেটায় তখন খুব লাগে। আজকাল কী করি জানো, শরীরটা খুব শক্ত করে রাখি। আর জ্যাঠা তা বুড়ো হচ্ছে, হাতের জোর

আর ক'দিন বলো !

উঃ, তুমি এটা অদ্ভুত লোকই বটে। কার মার লাগে, আর কারটা লাগে না সেইটাই বড় কথা হলো বুঝি ? মার খাবে কেন ? তোমার তো মার খাওয়ার কথাই নয়।

উদাসীন গলায় গোপাল বলে সেটাও ঠিক কথা। তবে মারলে কী আর করবো বলো।

সেই বুদ্ধিই তো দিচ্ছি তোমাকে। আগে ও বাড়ি থেকে পালাও। অন্য কোথাও কাজ ধরো। তারপর মুরুব্বি মাতব্বরদের ডেকে তোমার ন্যায্য পাওনা গণ্ডা আদায় করো। ও বাড়িতে থেকে দাবি দাওয়া যেন তুলতে যেও না। তা হলে তোমার জ্যাঠাইমা ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তোমাকে খাওয়াবে।

কথায় বাধা পড়লো। খুব কাছেই এক দঙ্গল কুকুর খ্যাঁকাচ্ছে।

গোপাল থেমে গিয়ে বললো, ন'পাড়ার সড়ালে কুকুর। ধরলে ছিঁড়ে ফেলবে। এ গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে না। বুঝলে। ঘুরে যেতে হবে। ওই পোড়ো শিবমন্দিরের পিছন দিয়ে পথ আছে।

কুকুর যদি তাড়া করে ?

করবে না। ওরা গাঁ চৌকি দেয়, গাঁয়ের বাইরে আসে না।

একটু বসবে কোথাও ? বড্ড লাগছে কোমরে।

গোপাল ভারী দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, মেয়েমানুষের হলো নরম শরীর। তাকে ওরকম মারতে আছে ! পরাণদাদাটা যেন কী ! তা ওই শিবমন্দিরের পাশে একটা বটগাছতলা বাঁধানো আছে। বসা যায় ! একসময়ে খুব বড়ো মেলা হতো।

আর কতটা পথ বলো তো সুতোহাটা ? তা আছে আরও খানিকটা। তাড়া নেই, সকাল সাতটার আগে বাস আসবে না।

চাতালটা শুকনো পাতা আর কুটোকাটায় ভরা। ধুলোও খুব জমেছে। হাত দিয়ে খানিক জায়গা সাফ করে গোপাল বললো, বোসো।

বড্ড শীত করছে যে গো।

জ্বর-গা, শীত তো করবেই। জিরিয়ে নাও।

বসতে না বসতেই একটু এলিয়ে পড়ে বাসন্তী। হাঁফ-ধরা গলায় বলে, পারবো তো গোপাল?

জিরোও তো। পরে দেখা যাবে।

বাসন্তী জিরোতে গিয়ে ঘুমে ঢুলে পড়ছিলো। গোপাল সেটা অন্ধকারেও লক্ষ্য করে বললো, এখানে কিন্তু সাপখোপের উৎপাত আছে।

ঝট করে উঠে বসলো বাসন্তী, চলো।

সেই ভালো। কাজ করতে গিয়ে আমিও দেখেছি জিরোতে গেলেই সর্ব্বোনাশ। না যদি জিরোও তা হলে অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কাজ করে যেতে পারবে।

জিরোতে তো তুমিই বললে।

গোপাল মাথা নেড়ে বললো, তা অবশ্য ঠিক। তবে বোকা লোকের কথা ধরতে নেই।

হাঁটা ধরার পর দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো না। তাতে হাঁফ বেশী ধরে। দুজনের পায়েরই কেমন যেন ধপ ধপ শব্দ হচ্ছে। পা যেন চাইছে না। তবু হাঁটাটা চলছে। একবার শুরু হলে আর থামা চলে না তো। কেমন যেন রোখ চেপে যায়, গোঁ ধরে যায়, নেশার মতো হতে থাকে। একটা শুকনো খাল পেরিয়ে ওপরে উঠে গোপাল বলে, ওই সুতোহাটা।

কোথায়?

ওই দেখা যাচ্ছে। মেল নারকোল গাছ। ওর পিছনে।

কতক্ষণ হেঁটেছে তার হিসেব নেই বাসন্তীর। তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে আছে ঘামে। বললো, কী করে পারলুম বলো তো! শুরুতে তো মনে হয়েছিলো, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো।

গোপাল বিজ্ঞের মতো বললো, হাঁটা খুব ভালো জিনিস।

শীতলাতলা, গোসাঁইপুকুর পার হয়ে যখন দুজনে গাঁয়ে ঢুকলো তখনও

রাতের অন্ধকার জেঁকে বসে আছে বটে তবে বাতাসে একটা ভোর-ভোর গন্ধও যেন পাওয়া যাচ্ছে।

বাস রাস্তা কোন্‌দিকে বলে গোপাল।

গাঁ পেরিয়ে। ও ধারটায়।

এখন একটু বসতে ইচ্ছে করছে কোথাও।

গোপাল নিশ্চিন্তির গলায় বলে, সুতোহাটা মস্ত গ্রাম। বাঁধানো চণ্ডীমণ্ডপ আছে। কোনোও ভাবনা নেই। তুমি বোসো, আমি একটু কাজ সেরে আসি।

বাসন্তী বলে, এত রাতে আবার কিসের কাজ?

গোপাল ভারী লাজুক ভঙ্গিতে মাথা চুলকে বললো, সে আছে। তোমাকে বলা যায় না।

বাসন্তীর একটু অভিমান হলো। বললো, দুজনে রাতবিরেতে পালিয়ে এলুম, কত সুখদুঃখের কথা হলো, আর এখন বলছো আমাকে বলা যায় না! এমন কী কথা শুনি? তোমার আবার গোপন করার মতো কথা আছে নাকি?

চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁকাই পেলো তারা। দু একটা কুকুর ছিলো। তবে ন'পাড়ার সরালে কুকুর নয়। প্রথমে ঘেউ ঘেউ করলেও গোপাল ঢিল তুলে তাড়া করতেই কেঁউ কেঁউ করে পালালো। তারপর সব লক্ষ্মী ছেলের মতো ফিরে এসে ঘুমোতে লাগল।

বলবে না তো কথাটা?

শুনলে হাসবে যে!

আচ্ছা, হাসব না। দিব্যি করছি।

হলো কী, সুতোহাটার কথা উঠতেই পিড়িং করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেই পাটের গুছি কেনার টাকাটা একজনকে দিয়েছিলুম।

তাই বলো। কাকে দিলে?

ময়না নামে একটা মেয়েকে।

ও বাবা ! এর মধ্যে আবার মেয়েছেলে ! সব্বোনেশে কথা।

সে বড় দুঃখী মানুষ গো। নিমাই ঘোষকে জিজ্ঞেস কোরো। সুতোহাটার পরেশ দাসের মেয়ে। বাপ নতুন বিয়ে করেছে আর দু নম্বর বউ মেয়েটার ওপর খুব অত্যাচার করছে। রাতবিরেতে ঘর থেকে বের করে দেয়। বড্ড আতান্তরে পড়েছে মেয়েটা। নেশার ঘোরে তার হাতেই টাকাটা গুঁজে দিয়েছিলুম রাতে।

বাসন্তী একটু হাসলো, নেশাখোরদের ওরকম হয়। মনটা দরাজ হয়ে যায় খুব। আমার বাবাকেও দেখেছি। কিন্তু সে টাকা কি আর পাবে।

চেয়ে তো দেখি। দেয় ভালো না দেয় তো আর কী করা যাবে। হ্যাঁ গো বউঠান, দিয়ে নিলে নাকি পরের জন্মে কালীঘাটের কুকুর হয় !

তাই তো শুনেছি।

গোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নয় তাই হবো। এ জন্মটাই বা কী ভালো যাচ্ছে বলো। তবু টাকাটা দিয়ে ফেললে পরাণদাদা আর জ্যাঠার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

বাসন্তী একটু হেসে বলে, বাড়ির সতী-লক্ষ্মী বউকে যে রাতবিরেতে বের করে আনলে সে বাবদে কি ছেড়ে দেবে তোমায় ?

গোপাল মাথা নেড়ে বলে, না, কপালে কষ্ট আছে। কত রকম যে দোষ-ঘাট হয়ে যায় তার হিসেবই রাখতে পারি না। যখন কিলটা চাপড়টা খড়মটা এসে পড়ে তখন টের পাই, কোন্‌টা দোষ হয়েছিল।

তোমাকে বড় বিপদে ফেললুম গো। আমি বলি কি, তোমার আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই। আমার বাপের বাড়িতে ক দিন থাকো, একটা কাজ ঠিক জুটে যাবে।

গোপাল বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, সেটা ভালো দেখাবে না।

ভালো যে দেখাবে না তা বাসন্তী খুব জানে। তাই চুপ করে রইলো। গোপালকে নিয়ে গিয়ে সে যদি বাপের বাড়িতে হাজির হয় তাহলে বাপের বাড়িতেও পাঁচটা কথা উঠবে। দু'য়ে দু'য়ে চার করে নেবে সবাই।

ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে।

ফিরে গিয়ে তুমি বড্ড মার খাবে ভাই।

বললুম তো, মার আমার ভালোই সয়। ও নিয়ে ভেবোনা।

আচ্ছা, আমার সঙ্গে নয় নাই গেলে, অন্য কোথাও তো যেতে পারো।

কোথায় যাবো ?

নিমাই ঘোষ তোমার কিছু করে দিতে পারে না ?

নিমাইবাবু হলো তো রাজাগজা লোক। ওদের কাছে হুট বলতেই যেতে নেই।

একটা কথা বলবো ? আমি কিছু গয়না নিয়ে এসেছি। তোমাকে এক-জোড়া দুল যদি দিই, বেচে কিছু টাকা পেয়ে যদি দোকান টোকান দিতে পারো।

গোপাল জিব কেটে বলে, ঘরের গয়না হলো লক্ষ্মী, ও বের করতে নেই! তুমি বোসো, আমি ধাঁ করে ঘুরে আসছি।

এই কাকভোরে গিয়ে মেয়েটাকে জাগাবে ? তোমার আক্কেলটা যে কী!

ভোরের আর বাকীই বা কী বলো। পূবদিক ফর্সা হতে লেগেছে।

গোপাল হন হন করে হেঁটে বুড়োর দোকানের সামনে দাঁড়ালো। দোকানের ঝাঁপ ফেলা। সব সুনসান। টাকাটা আদায় না করলেই নয়। গোপাল সাহস করে এগিয়ে গিয়ে যাঁহাতক দরজায় ধাক্কা দেবে তাঁহাতক নজরে পড়লো, একধারে বস্তাবন্দী কী যেন পড়ে আছে। বেওয়ারিশ বস্তা দেখলে গোপাল ভয় খায়। গেল বছর তাদের রথতলায় ঠিক এরকমই একখানা বস্তা দেখে নিবারণ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছিল আর কি। বস্তায় একখানা গলাকাটা লাশ। কোন্ বউকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। নিবারণের ওপর সে কী হম্বিতম্বি করলো পুলিশ। পাশের গাঁ সিবিপুরের হরিশ মণ্ডলের বউ বিলাসীর লাশ বলে যখন জানা গেল তখন পুলিশ গিয়ে ধরলো হরিশকে। তবে তারও সাজা হলো না, পিছলে বেরিয়ে গেল। খুনটা করেছিল বটে রতন মান্না।

বস্তা দেখে পিছিয়ে এল গোপাল। গতিক সুবিধের নয়।

মানে মানে যখন পিছিয়ে আসছে তখনই একটা কুকুর এমন চেঁচালো যে, গোপাল আঁতকে উঠলো ভয়ে। আর কোন্ ভুতুড়ে ব্যাপার কে জানে, বস্তাটাও একটা নাড়া খেলো যেন।

আলো ফুটি-ফুটি ভাব। বস্তার মুখ দিয়ে একখানা মানুষের মুখ বেরিয়ে আসছে দেখে গোপাল ভয়ে চোখ বুজে ফেললো।

খোনামতো গলায় কে যেন বলে ওঠে, উঃ বাবা গো, বড্ড ব্যাথা যে শরীরে।

ভূত নয়, লাশও নয়। নিয্যস মানুষই বটে। গোপাল গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, তা এখানে কী হচ্ছে?

মেয়েটা উঠে বসলো। এক ঢল চুল। সেগুলো এলো খোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে বললো, মুখে আগুন আমার। কী আবার হবে। রাতে দাদু দোকানে ঢুকতে দিলে না, বস্তাখানা ছুঁড়ে দিয়ে বলে, কারো দাওয়ায় গিয়ে পড়ে থাক গে। আমার বড় কলঙ্ক হচ্ছে, তোকে দোকানে রেখে! বলো কথা, আমি তাহলে যাবো কোথায়?

গোপাল একটু তফাৎ রেখে উবু হয়ে বসে পড়ে বললো, তুমিই কি ময়না নাকি? পরেশ দাসের মেয়ে!

হ্যাঁ গো। তুমি কে?

পরশু রাত্রিরে নিমাই ঘোষের সঙ্গে এসেছিলুম, মনে নেই?

মেয়েটা আগাপাশতলা তাকে একবার দেখলো। তারপর বললো, নিমাই-কাকাই তো আমার সর্বোনাশটা করে গেল। দাদুকে এমন ভয় দেখালো যে, দাদু আর দোকানে ঢুকতে দিলো না। তবে তুমি লোকটা খারাপ নও। আমাকে টাকা দিয়েছিলে।

গোপাল আশার আলো দেখতে পেয়ে খুব ব্যাকুল গলায় বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই টাকার ব্যাপারেই আসা।

কী ব্যাপার বলো তো! টাকা ফেরৎ চাও নাকি?

এ কথায় গোপালের বড় লজ্জা হলো। আমতা আমতা করে বললো, কী জানো, টাকাটা আমার নয় কি না। জ্যাঠা দিয়েছিল পাটের গুছি কিনতে। তোমার দুর্দশা দেখে নেশার ঘোরে দিয়ে ফেললুম। বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে বাড়িতে।

মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বললো, টাকা দিয়ে আমার কোন্ কচুটা হবে। বাড়িতে জায়গা নেই, দাদু ঠাঁই দিচ্ছে না, আমার এখন মরণ। তুমি ভেবো না। টাকা আছে।

গোপাল এক গাল হেসে বলে, আছে! বাঁচালে।

মুসুরির ডালের বস্তায় হাত ঢুকিয়ে অনেক নিচে গুঁজে রেখেছি। দাদুর দোকান খুলুক, ঠিক বের করে দেবো।

পুরোটাই আছে?

পুরোটাই। টাকা দিয়ে এখন আর কী হবে বলো।

মেয়েটা এক গাছ বেশ লম্বা দড়ি বস্তার ভিতর থেকে বের করে দেখায়। বলে, কাল রাতে কুয়োর বালতি থেকে খুলে এনেছি।

দড়ি? ও দিয়ে কী হবে?

গলায় দেবো গো। সব। সব শান্তি হবে এবার, সকলের বুক জুড়োবে।

বলো কী? কাজটা তো ভালো হচ্ছে না। এ তো ভালো কাজ নয়।

একটু ঘুরে এসো। দোকান খুললে টাকা পেয়ে যাবে। ঋণ রাখবো না বাবা।

টাকা চাইতে এসে এ কোন্ ফেরে পড়ে গেল গোপাল? লাশ বলে ভেবে ভুল করেছিলো ঠিকই কিন্তু এ মেয়ে তো হরে দরে লাশই হতে চলেছে! মেয়েদের ওপর বড্ড অত্যাচার হচ্ছে নাকি চারদিকে? এটা তো ঠিক হচ্ছে না।

গোপাল আমতা আমতা করে বলে, কাজটা ভালো হবে না কিন্তু।

খুব ভালো হবে। ওটি কে বলো তো, তোমার বউ নাকি?

বউ! বলে অবাক হয়ে পিছু ফিরে গোপাল দেখে, বাসন্তী পুঁটুলি বগলে

দাঁড়িয়ে।

গোপালের দিকে চেয়ে ময়না ফিক করে হেসে বলে, সাতসকালে টাকা আদায় করতে এসেছো, তাও আবার বউ নিয়ে!

বাসন্তী এগিয়ে এসে বলে, ওই হাঁদা গঙ্গারামের বউ হতে বয়েই গেছে আমার। উটি আমার সম্পর্কে দেওর। তুমিই বুঝি ময়না!

কোমব অবধি বস্তার মধ্যেই ছিল ময়না এতক্ষণ, এবার বস্তাটা ছাড়িয়ে পুরোপুরি বেরোলো। ভোরের আবছা আলোয় তখন কাহিল দেখাচ্ছিল ময়নাকে। বললো, ময়না এখন পাখনা মেলেছে। উড়ে যাবে গো। টাকা চাই তো। একটু দেরী হবে বাপু। দাদু উঠবে, দোকান খুলবে, তারপর।

গোপাল ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, টাকার কথা হচ্ছে না। পরেশ দাস তো খুব খারাপ লোক দেখছি। নিমাইবাবুও বলছিল বটে কথাটা।

তেতো গলায় ময়না বলে, খারাপ কে নয় শুনি! এই যে পরশু রাত্তিরে তোমাকে ভালো লোক বলে ভেবেছিলুম, এই আজ সকালেই তো বুঝলুম তুমিও খারাপ লোক।

এ কথায় গোপাল একটু থতমত খেয়ে বললো, ওইটেই তো হয়েছে মুশকিল। নিমাইবাবু বলে, আমি ভালো লোক, জ্যাঠা বলে খারাপ। এই বউঠান বলছে ভালো, তো তুমি বলছো খারাপ। আমি বাবু তাল রাখতে পারছি না। তা খারাপই ধরে নাও।

শুধু কি তুমি! কাল রাত্তিরে কী কাণ্ড হলো জানো?

উবু হয়ে বসাই ছিল গোপাল, তার গা ঘেঁষে বাসন্তীও বসে পড়লো।

ময়না বস্তাটা পিঠের ওপর দিয়ে জড়িয়ে বসার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, তোমাদের নিমাই ঘোষ গো। কেমন লোক সে? না, দোষঘাট কিছু থাকতে পারে, তবে বড্ডো বড় মন।

গোপাল সায় দিয়ে বলে, তা বটে। পরশু যা খাওয়ালে! রুটি আর গরম মাংস—

ছাই জানো। কাল রাত্তিরে নিমাই ঘোষ পাইক নিয়ে হাজির। ঘোর

মাতাল। বাবার ওপর খুব তম্বি করলে, মেয়েটার ওপর অত্যাচার করছো, পাঁচ গাঁ ডেকে সালিশ বসাবো, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। আমার বাবা একটু ভয়ও খেয়েছিল ঠিক। নিমাই ঘোষ তারপর কী বললো জানো? বললো, ঠিক আছে, মেয়ে যদি তোমার এতই ফেলনা হয়ে থাকে তো আমিই দায় উদ্ধার করে দেবো।

গোপাল হাঁ হয়ে বললো, তার মানে?

বাসন্তী তাকে একখানা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললো, মানে বোঝোনা। হাঁদা কোথাকার। বিয়ে করতে চায়।

অ্যাঁ! বলে আরও বড় হাঁ করলো গোপাল। সেই হাঁয়ের মধ্যে আস্ত এক-খানা বেল ঢুকে যায়।

ময়না বলে, কী লজ্জার কথা বলো। কাকা বলে ডেকে আসছি সেই কবে থেকে। বাপের বন্ধু। ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কালই।

গোপাল একখানা শুকনো ঢোঁক গিলে বললো, পরেশ দাস রাজি হলো বুঝি?

হবে না কেন? তার তো এখন ঘাড় থেকে মেয়ে নামলে বাঁচে।

বিয়ে করে?

বিয়ের গলায় দড়ি।

গোপাল ফের ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, নিমাইবাবুর এ কাজটা মোটেই ভালো হয়নি। তার বউ আছে, বাঁধা মেয়েমানুষ আছে। উহুঁ এ কাজটা ঠিক হয়নি। তবে মানী লোক, কখন কী খেয়াল হয়।

অমন মানীর মুখে আগুন। আমিও ছেড়েছি নাকি ভেবেছো? যখন দেখলুম বাপ আর তার বদমায়েশ বউ খুব রাজি তখন নিজেই বেরিয়ে খুব কষে দু চার কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তাই তো রাতে খাওয়া জুটলো না। বাপ কোনওদিন গায়ে হাত তোলেনি, কাল রাতে বউয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মারলো। নিমাইবাবুর সামনেই।

তাদের গাঁয়ের বিশ্বেসমশাই প্রায় সময়েই তামাক খেতে খেতে মাথা নেড়ে

বললেন, দেশটার যে কী হলো! তা গোপালেরও কথাটা এখন কইতে ইচ্ছে করলো, ঠিক ওই রকম ভাবে। সে গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললো, দেশটার যে কী হলো!

ভালোই হলো। সকলেরই ভালো হবে যদি এ মুখপুড়ী গলায় দড়ি দিয়ে বেল গাছ থেকে একবার ঝুলে পড়তে পারে। কালে রাতেই দিতুম।

গোপাল খুব আগ্রহের সঙ্গে বললো, তা দিলে না কেন?

ভাবলুম একবার ভগবানকে ডাকি। জন্মের শোধ। মরাটা তো হাতেই আছে। দড়িও আছে। কোনো দিন ডাকিনি তো। কাল রাতে দাদু যখন দোকানে ঢুকতে দিলো না তখন বস্তায় ঢুকে কুমড়ো গড়াগড়ি দিয়ে খুব কাঁদলুম আর ভগবানকে ডাকলুম।

গোপাল বেশ ঝুঁকে পড়ে জুলজুলে চোখে চেয়ে বললো, কোনোও কাজ হলো তাতে?

হলো তো লবডঙ্কা। ভোর না হতেই দেখি পাওনাদার এসে বসে আছে।

গোপাল একেবারে চুপসে গিয়ে বললো, কিছু মনে কোরো না। আমারও সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।

বাসন্তী কথা বলছিলো না। মেয়েটাকে দেখছিলো। একেবারে অপলক চোখে, বাক্যহারা হয়ে! হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, মেয়েমানুষের আর এগারো হাতেও কাছা হলো না।

৪

কাল সন্ধেবেলা নিমাই ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরাণের। গণেশের বাড়ি ছাড়িয়ে রথতলার দিকে মোড় নিতেই পিছন থেকে নিমাই ঘোষ খুব ছুট-পায়ে এসে ধরে ফেললো, পরাণভায়া যে !

পরাণ সাঁঝবেলাতে বউ ঠেঙিয়েছে, তারপর গোপালকে। মেজাজ একেবারে তিরিক্ষে হয়ে আছে। তিরিক্ষে বললে কম বলা হয়। তিন তিরিক্ষে নয়। তবে নিমাই ঘোষ হেঁজিপেঁজি লোক নয়। মানীগুণী লোক মেজাজটা চেপে দেঁতো হাসি হাসতেই হলো। বললো, এই একটু যাচ্ছি।

নিমাই ঘোষের একটা বড় বদ স্বভাব।'সঙ্গে কেউ থাকলে পট করে কাঁধে হাত তুলে দেয়। তবে নিমাই ঘোষের হাত বলে কথা। সে তো আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফেলে দেওয়া যায় না। নিমাইকে সবই মানায়। পাঁচটা গাঁয়ে পাঁচটা মেয়েমানুষ রাখা আছে, সব হিসেব নিমাই নিজেও বুঝি জানে না। তার বিয়ে করা বউই তিনটে, জুয়ো খেলে, মদ খায়। তবু কার বুকের পাটা আছে নিমাইকে মুখের ওপর কিছু বলে ? এই যে গোপালকে নিয়ে গিয়ে মদ গিলিয়ে আনলো, পারবে পরাণ কথাটা তুলতে ? নিমাই ঘোষের নামে সবাই কেমন তটস্থ।

নিমাই হাঁটতে হাঁটতে বললো, তোমাদের গাঁয়ের পাট এবারে তুলতে হচ্ছে।

কেন নিমাইদা, হলোটা কী ?

জানোই তো ভায়া গণেশের বাড়িতে আমার একটু যাতায়াত ছিল। ওই শিবানীর সঙ্গে একটু ইয়ে আর কি—সবই তো জানো। আমার আবার অত রাখঢাক নেই।

পরাণ যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলে আহা, তাতে কী হয়েছে।

কিন্তু মেয়েমানুষ সবই একরকম। বউগুলোও যেমন, রাখা মেয়েছেলেগুলোও তেমন। সেই নাকি কান্না, চোখের জল, আবদার, কথায় কথায় গাল ফোলানো। ফূর্তিটাই মাটি হয়ে যায়। তার ওপর মদ খেলে গোঁসা হয়, অন্য মেয়েছেলের কথা উঠলে গাল ফোলায়। নাঃ, আর পারা যায় না। বয়সও হচ্ছে।

তা বটে।

বয়স হলে একটু কচি কাঁচার দিকে ঝোঁক হয়। হয় কিনা বলো!

তা হয়।

তাই ভাবছি, শিবানীব পাটটা এবার তুলে দেবো। খরচাও হচ্ছে মেলা। আসি-যাই দেখে গণেশ নানা ধান্ধায় বেশ টাকা নিচ্ছে। তার তো হাজারো ফিকির।

পরাণ শ্রদ্ধার সঙ্গে চুপ করে থাকে। নিমাই ঘোষের মুখে পান জর্দ্দা। তার গন্ধ আসছে। মদটা এখনও খায়নি।

নিমাই বেশ ভর দিয়েছে পরাণের কাঁধে। বললো, কাল খুব একখানা কাণ্ড হলো।

কী কাণ্ড নিমাইদা?

বলতে ভরসা হয় না রে ভাই। পাঁচ কান হলে ব্যাপারটা খারাপ হবে। এসব ক্ষণজন্মা লোক, এদের খুব আড়াল করে রাখতে হয়।

কার কথা বলছেন?

তাকে তুমিও চেনো, আমিও চিনি। তুমি একভাবে চেনো, আমি অন্য ভাবে। তবে ধরা কি দেয় রে ভাই? চরণগঙ্গার ঝুলন সাধুকে চেনো তো? সেই যে চব্বিশ ঘণ্টা একটা দোলনায় বসে থাকে!

শুনেছি। যাইনি কখনও।

গেলে ভালো করতে। অবশ্য পেট থেকে কথা বের করা খুব শক্ত। বছরে এগারো মাসই মৌনী। তা যাকগে, ঝুলন সাধুকে একবার খুব সেবা

দিয়েছিলুম। সর্ষের তেলের আকাল সেবার। এক টিন নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলুম। রাজেনের ঘানি-ভাঙা তেল।

পরাণ একটু চেগে উঠে বললো, তাই নাকি ?

তা ঝুলন সাধু বললো, ব্যাটা, চাস কী ? তোর তো সবই আছে। তখন বললুম, বাবা, সব থেকেও নেই। আমার হাতে তাস ওঠে না। তিন পাত্তির নেশা আছে জানো তো !

তা জানি।

বললুম, মাছ ধরতে বসলে মাছ আমার চার খায় না, ঠুকরে চলে যায়। মেয়েমানুষ বশ হয় বটে, কিন্তু প্রাণ অতিষ্ঠ করে দেয়। আরও এরকম অনেক কথা। সকলেরই তো এসব নালিশ থাকে, তাই না ? ঝুলন সাধু বললো, যা ব্যাটা, হাটে মাঠে বাটে ঘোর, ঘুরতে ঘুরতে একজনকে পেয়ে যাবি। তাকে সঙ্গে রাখিস, সব হবে।

বলেন কী ?

তাই তো বলছি রে ভাই। ঝুলন সাধুকে ঠেসে ধরলুম, বলো কে সেই লোক। সাধু কিছুতেই বলে না। অনেক চাপাচাপিতে বললো, তার বাঁ চোখটা ডান চোখের চেয়ে ছোটো। ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ নেই। হাত দুটো খুব লম্বা।

বললো ?

সেই থেকে খুঁজছি। তা বছর দুই তো হবেই। কাল কী হলো শুনবে ? বললো বিশ্বেস হবে না। সীতেপুরের হাটে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখি গোপাল। হাঁদা মানুষ। পেরিয়েই যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হলো, গোপালের হাত দুটো বেশ লম্বা না ? দাঁড়িয়ে গেলুম। ভাই রে, কী বলবো তোমাকে, প্রতিটি লক্ষণ হুবহু মিলে গেল।

পরাণ থমকে গেল, গোপাল !

পরের বৃত্তান্তটা শোনোই না। পিলে চমকে যাবে। বগলার আড্ডায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলুম। বললুম, তাস আমি ছোঁবোনা, তুই খেলবি,

আমি টাকা ফেলবো।

কী হলো ?

বললুম তো তোমার বিশ্বাসই হবে না। প্রথম দানেই রানিং ফ্লাশ তুললো। দ্বিতীয় দানে ছুরির ট্রায়ো। তারপর থেকে দশ আঙুলে যেন মা লক্ষ্মী লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ঝাঁপি উপুড় হয়ে পড়লো। এক বোর্ড থেকে সাড়ে তিনশো টাকা তুলে আনলুম।

বলো কী নিমাইদা ?

তাই তো বলছি। এসব ক্ষণজন্মা লোককে কি সহজে চেনা যায় ? তোমার বাড়িতে মুনীশ খাটছে, মাটি কোপাচ্ছে। গরু রাখছে, বাইরে থেকে দেখে চিনতেও পারবে না। ভগবানের লীলা রে ভাই। তাই তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে। একটু ভেবেচিন্তে দেখো।

পরাণের বুকের ভেতরটা কেমন করছিলো। ধক.ধক ধক ধক।

কিসের কথা ?

গোপালকে ছেড়ে দাও। আমি থোক কিছু টাকা দিচ্ছি। নিজের কাছে নিয়ে রাখব। ঝুলন সাধুর কথাটা পরীক্ষা করেই দেখি।

পরাণ সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে বলে, তাই কি হয় ? গোপাল তো আর বিক্রির জিনিস নয় নিমাইদা।

জানি রে ভাই। এ বিকিকিনির কথাও নয়। দাসপ্রথা কবে উঠে গেছে। বলছিলুম গোপালকে ছাড়লে তোমাদের অসুবিধে হবে হয়তো। সেটা পুষিয়ে নিতে যা টাকা লাগে দেবো। দু পাঁচ হাজারেও আপত্তি নেই। ও মানুষের মর্ম তোমরা বুঝবে না। তাই বলছি ছেড়ে দাও। আমার কাছে থাকুক।

পরাণ কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়লো। কথাটা সত্যি হলে তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে এতকাল। একটু আগে সে তো পয়মন্ত লোকটাকে লাথিয়ে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। কাজটা তো তবে ঠিক হয়নি।

পরাণ জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললো, শত হলেও আমার ভাই।

মা-বাপ নেই, আমাদের কাছেই মানুষ। লোকটাকে পট করে অন্যের কাছে দিই কি করে বলো!

নিমাই উত্তেজিত হলো না। ভারী মাখো-মাখো গলায় বললো, শোনো হে পরাণ, গোপালের নামে তার বাবা যে সব বিষয় সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিল, আর ওঁর মায়ের যেসব গয়না ছিল তার পাই পয়সা অবধি হিসেব আমার কাছে আছে। ও ছোঁড়া আহম্মক বলে আদায় করতে পারেনি। কিন্তু বাইরে আহম্মক বলে তোমরা যে খোদার ঘর সিধে দেখবে তা কিন্তু নয়। আজ থেকে আমি ওর পিছনে আছি। তোমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে নিমাই ঘোষের কতদিন লাগবে হে!

তটস্থ হয়ে পরাণ বলে, নিমাইদা, আপনি ভারী রেগে যাচ্ছেন।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, আমি রাগলে অন্য চেহারা। সে চেহারা তোমার না দেখাই ভালো। রাগিনি তোমাকে বোঝাচ্ছি। শোনো হে বাপু, কু-মতলব থাকলে তোমার কাছে কথাটা পাড়তুম কি? ইচ্ছে হলে গোপালকে ফুসলে তুলে নিয়ে যেতে পারতুম না? কিছু করতে পারতে আমার?

সে কথা তো বলিনি।

আমিই বলছি। তুমি বলবে কেন, তোমার ঘাড়ে কটা মাথা যে, নিমাই ঘোষের কথার ওপর কথা কইবে? তা নয় হে, আমি লোকটা সাচ্চা বলেই তোমাকে বললুম, দু পাঁচ হাজার যা লাগে দেবো, ছেড়ে দাও। টাকাটা তোমাদের ফালতু লাভ। আমি বিনা টাকাতেই গোপালকে তুলে নিয়ে যেতে পারি। কী বলো, পারি না?

অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে পরাণ বলে, আজ্ঞে তা পারেন।

তুমি তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা কয়ো। আমি জোর জবরদস্তি কাজ করতে ভালবাসি না।

কিন্তু আমার মা যে গোপাল বলতে অজ্ঞান।

জানি হে বাপু জানি। গাঁয়ে কারও ঘরের কথা গোপন থাকে না। কার বাড়িতে কী হচ্ছে সব খবর কাকের মুখে রটে যায়। ওসব আমাকে বলে

লাভ নেই। ও জিনিষ তোমরা ঘরে রাখতে পারবে না। বোকা গোপালের মধ্যে যা জিনিস আছে তা কাজে লাগাতে পারলে আজ তোমরা লাখো-পতি হয়ে যেতে। তা তোমাদের কপালে নেই কী আর করবে। ও হচ্ছে একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের বাচ্চা। তাকে দিয়ে মুনীশ খাটিয়ে মারলে হে!

পরাণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, কি করে বুঝবো বলুন! বড্ড বোকা যে।

বোকা সেজে থাকে হে! ওরা কি সহজে ধরা দেয়? ওদের স্বরূপ বুঝতে হলে তেমন চোখ চাই।

আপনি ওকে নিয়ে কী করবেন?

পালাবো পুষবো যত্ন করবো! সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরবো। তাস ধরাবো, ছিপ ধরাবো। ও নিয়ে ভেবো না।

বড্ড বিপদে ফেললেন নিমাইদা।

বিপদ কিসের? মনে করো চাকরি পেয়ে কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা ভায়া, চলি। একটা কচি মেয়ের সন্ধান আছে। কাল আর হবে না। সুতোহাটা থেকে ফিরতে বেলাও হবে। পরশু সকালের দিকে এসে পড়ব'খন। তোমার বাবাকে বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখো। গোপাল আমার সঙ্গেই যাবে! আর টাকাটাও নগদ ফেলে দেবো'খন। চাপাচাপি কোরোনা, পাঁচ হাজারই দেবো। আরও একটা কথা শুনে রাখো। রতন মান্না আমার সঙ্গেই থাকবে।

বটতলার কাছ বরাবর নিমাই ভিন্ন পথ ধরলো। পরাণ খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ পাতাল ভাবলো। পাঁচ হাজার টাকায় গোপালকে কিনতে চাইছে লোকটা! তাহলে গোপালের মধ্যে কি সত্যিই কোনোও ব্যাপার আছে? টাকাটা তো খুব কম নয়! গ্রাম-দেশে এত টাকা কেউ এমনি এমনি ঝপ করে বের করে না।

পরাণ বড় ভাবিত হয়ে পড়লো। গোপাল আছে বলেই কি তাদের সংসারে

এখনোও তেমন অভাব টভাব নেই! গোপালের জন্যই কি গরুগুলো অঢেল দুধ দেয়? ক্ষেতের ফলনও কোনোওবার মারা যায় না?
তবে তো বড় অনাদর হয়েছে লোকটার!
পরাণের একবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। তারপর ভাবলো, কালকের দিনটা তো হাতে আছে। তেমন বুঝলে গোপালকে সরিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ?
রাতে যাত্রার আসরে বসেও সারাক্ষণ এইসব কথাই তোলপাড় হতে লাগলো পরাণের মনে। নাঃ, খুব ভুল হয়েছে তো। ভগবানের লোকের দারুণ হেনস্থা হয়েছে তাদের বাড়িতে। কাজটা ঠিক হয়নি।
কাণ্ডটা ঘটলো যাত্রা দেখে ফেরার সময়। বলাই সামন্তর সঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে ফিরছিলো। হঠাৎ বলাই বললো, ওরে পরাণ, একটা কথা।
কী কথা?
কাল সীতেপুরের হাটে গিয়েছিলুম। সেখানে বগলার আড্ডায় দু হাত খেলতে গিয়ে দেখি, তোদের সেই আধ-পাগলা ভাইটাকে নিয়ে গিয়ে নিমাই ঘোষ হাজির।
পরাণ চমকে উঠে বলে, অ্যাঁ!
বলাই হেসে বললো, গোপাল অবশ্য আমাকে চিনতে পারেনি। তবে যা একখানা কাণ্ড হলো বলার মতো কথা বটে!
পরাণের গলা শুকিয়ে গেল। বললো, কী কাণ্ড?
ওফ্ সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। তোর ভাইকে দিয়েই তো খেলাচ্ছিলো নিমাই। যে তাস তোলে সেটাই মার মার কাট কাট। রানিং ফ্লাশ, ট্রায়ো, রান—সে যে কী অশৈলী কাণ্ড! একেবারে লুটেরার মতো বোর্ড চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেল। আমরা তো ভাবলুম মন্তর তন্তর করেছে বুঝি। এরকম তাস যে কারোও হাতে ওঠে তা জন্মে দেখিনি।
পরাণ ঢোঁক গিলে বললো, তাই নাকি?

ওফ্, তাসের যা কপাল দেখলুম ছোঁড়ার, শুধু জুয়ো খেলেই লাখোপতি হতে পারবে।

রাত্তিরে পরাণের আর ঘুম হলো না। মাথাটা খুব গরম লাগছে। নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করছে। গোপালের মধ্যে যদি অশৈলী কিছু থেকেই থাকে তবে তারা এতোদিন টের পেলো না কেনো? এ তো বড্ড আহাম্মকি হয়েছে! এখন গোপাল যদি নিমাই ঘোষের সঙ্গে চলে যায় তাহলে কি তাদের হাঁড়ির হাল দেখা দেবে নাকি? পরাণ এসব মানে। তন্তরমন্তর ঝাড়ফুঁক, অপয়া পয়মন্ত—এসব আছেই।

কিন্তু সমস্যা হলো গোপালকে আটকানো যায় কিসে? নিমাই ঘোষ টাকা ফেলে জবরদস্তি যদি নিয়ে যায় তো করার কিছু নেই। এক উপায় হলো গোপালকে যদি লোভ দেখিয়ে বেঁধে ফেলা যায়। আহাম্মকটা নিজে যেতে না চাইলে নিমাই ঘোষ হয় তো বা রেহাই দিতেও পারে। কিন্তু গতিক যা দাঁড়িয়েছে তাতে গোপালকে আটকানো শক্ত হবে। অতো লাথিঝাঁটা চালানোটা ঠিক হয় নি তাদের। বাপটাও প্রায়ই খড়মপেটা করে। আর মাও কিছু কম যায় না। ছোঁড়ার খিদে পায়, খাই-খাই করে, আর মা বলে কাজের লোককে বেশী খাওয়াতে নেই। তাহলে আলসে হয়ে পড়বে। কাজ করতে চাইবে না।

নাঃ, বেজায় চালে ভুল হয়ে গেছে। সকাল সকাল গিয়ে এখন গোপালকে হাত করা দরকার।

আলো ফুটবার আগেই পরাণ উঠে পড়লো। বলাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। তাকে ডাকাডাকি করে তুলে সাইকেলের চাবিটা চেয়ে নিলো। বললো, চললুম রে, বড্ড তাড়া আছে। বিশেকে দিয়ে একটু বেলার দিকে সাইকেলটা পাঠিয়ে দেবোখন।

সাইকেলখানা আজ একেবারে ঝড়ের বেগেচালিয়ে দিলো পরাণ। ঘরের লক্ষ্মী চলে যাচ্ছে। সব্বোনাশটা না ঠেকালেই নয়।

খুব চালিয়েও রোদ ওঠার আগে পৌঁছতে পারলো না। যখন পৌঁছোলো

তখন বাড়িতে বেশ একটা জটলা। বাবা পায়চারি করছে। মা জলচৌকিতে মাথায় হাত দিয়ে বসা।

সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় হড়াস করে পড়ে গেল। চেন-এর কিড়কিড় শব্দ, পিছনের চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে।

মা ডুকরে উঠে বলে, ওরে, তোর যে বউ পালিয়েছে!

সাইকেলটা তুলে ফের দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করালো পরাণ। বললো, নাকি? তা ভালো। কিন্তু গোপাল কোথায়? ঘরের লক্ষ্মী! গরু নিয়ে মাঠে গেছে বুঝি? বিশেকে পাঠাও তো, ডেকে আনুক। বিশে, ওবিশে…

ওরে ও পরাণ! বলি কথাটা কি কানে গেছে? তোর বউ যে পালিয়েছে!

পরাণ একবারেই কথাটা শুনেছে। দ্বিতীয়বার বলার দরকার ছিল না। মায়ের দিকে চেয়ে বিরক্ত গলায় বললো, তো হয়েছেটা কী? চেঁচাচ্ছো কেন? একটা গেলে আর একটা আসবে। বাজারে মেয়ের অভাব নাকি? এখন গোপালকে ডাকো। বড্ড জরুরী দরকার। ঝুলন সাধুর সব লক্ষণ মিলে গেছে। অশৈলী কাণ্ড।

বাপ পায়চারি বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। সেই বাঘা চোখ। পলক পড়ছে না। গলাটা একটু ঝেড়ে বললো, সেই অকালকুষ্মাণ্ডটার সঙ্গেই পালিয়েছে। বুঝলে! পাঁচজনকে আর মুখ দেখানোর জো রইলো না?

অ্যাঁ! বলে খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলো পরাণ, গোপাল নেই? সর্ব্বনাশ!

মা এবার ঝাঁঝের গলায় বলে, তোর ব্যাপারখানা কী বল তো! বউ পালিয়েছে তা গ্রাহ্যি করছিস না, গোপাল গোপাল করে হিঁদিয়ে মরছিস কেন?

পরাণ বেশ একটু চোখ রাঙিয়েই বলে উঠলো, গোপাল গোপাল করছি কি আর সাধে? গোপাল হলো ঘরের লক্ষ্মী। সে গেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

পরাণের বাপ আর মা এ কথায় এমন হাঁ করে রইলো যে, মুখে চড়াই পাখি ঢুকে যেতে পারে।

পরাণ দাওয়ায় ধপ করে বসে পড়ে মাথার চুল দু হাতে মুঠো করে ধরে বললো, উঃ, যদি গোপালকে ফেরানো না যায় তাহলে ঘোর অমঙ্গল হয়ে যাবে। সংসার যাবে ছারখারে। সে জানে, গিয়ে সেই নিমাই ঘোষের খপ্পরেই পড়লো নাকি! আমি আর ভাবতে পারছি না।

পরাণের মা আর বাপ নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে নিলো। দুজনের চোখেই ভোম্বল ভাব। বাড়ির অন্যান্যরা সব দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে দূরে। বউ-ঝি-রা ফিসফাস করছে। বাচ্চারা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সব। পরাণের আর সব ভাইরা বেরিয়েছে তল্লাশে।

পরাণ হঠাৎ রক্তচক্ষু করে বাপের দিকে চেয়ে বললো, আপনার জন্যই তো সর্বনাশটা হলো। কেন আপনি যখন তখন ও বেচারাকে খড়মপেটা করেন, কেন যখন তখন মা-বাপ তুলে গালাগাল দেন? কিসের অত তেজ আপনার? ভাবেন বুঝি রক্তচোখ করে থাকলেই খুব বীরত্ব হলো।

পরাণের বাপ দাপের লোক, আজ অবধি তার মুখের ওপর কথা বলা দূরে থাক, ছেলেরা চোখে চোখ রেখে অবধি কথা বলেনি। পরাণের এই রুদ্রমূর্তি দেখে বাপ যেন বিশ্বাসই করতে পারলো না যে, এ রকম ঘটনা সত্যিই ঘটছে।

পরাণ এবার তার মায়ের দিকে চেয়ে বললো, আর তোমারও পেটে পেটে শয়তানি বড় কম নয়। ছোঁড়াকে ভালো করে খেতে দাও না, পাঁচজনের পুরোনো জামাকাপড় পরে বেচারা থাকে, দিনরাত খালি গঞ্জনা দিচ্ছো। তোমাদের নরকেও ঠাঁই হবে ভেবেছো?

বাপের হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো যেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচালো, মুখ-সামলে মুখ-সামলে—

বাপের গলার ওপর আর এক পর্দা গলা তুলে পরাণ ধমকে উঠলো, চোপ বুড়ো শকুন! ওসব চোখ রাঙানোর জমানা আর নেই, মুখ আপনি সামলান। লজ্জা করে না নাবালোকের বারো বিঘে জমি গাপ করে নিতে? দশ ভরি সোনার গয়না পাঁচু স্যাকরাকে বাড়িতে ডাকিয়ে গলিয়ে

অন্য কাজে লাগান নি ? সাধে আগুন লাগবে সংসারে ? আপনাদের মতো পাষণ্ডদের জন্যই লাগবে। কাল সকালে যখন নিমাই ঘোষ এসে পাঁচ হাজার টাকা ফেলে গোপালকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে তখন কোথায় থাকবে আপনার তেজ ? তখন আটকাবেন তো, দেখবো কতো মুরোদ ! আপনি তো ঘরের বাঘ আর বনের শেয়াল।

পরাণের বাপের মস্ত তাগড়াই গোঁফ একথায় হঠাৎ যেন ঝুলে পড়লো। চোখের জুলজুলে ভাবটাও দপ করে নিবে গেল।

মা ডুঁকরে উঠে বললো, ওরে পরাণ, মাথা ঠাণ্ডা কর, মাথা ঠাণ্ডা কর। কী সব বলছিস বাপ, আমরা যে বুঝতে পারছি না। কী হলো তোর হঠাৎ ? অমন করে মা-বাপকে খুঁড়তে আছে ?

পরাণ বাপকে ভস্ম করে দেওয়ার চোখ নিয়েই চেয়েছিলো। এবার সেই চোখ মায়ের দিকে ফিরিয়ে বললো, কী হয়েছে শুনতে চাও ? নিজের কবর নিজে খুঁড়ে রেখেছো। এখন ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসার জোগাড়। কাল নিমাই ঘোষ আসবে গোপালকে নিয়ে যেতে সঙ্গে রতন মান্না থাকবে।

খুলে বলবি তো বাপ। কেন নেবে, কী বৃত্তান্ত, পাঁচ হাজার টাকাই বা কিসের ?

পরাণ ফুঁসে উঠে বলে, পাঁচ হাজার তো কম দিচ্ছে। গোপালের আসল দাম পাঁচ লাখ, পঞ্চাশ লাখ ধরলেও বেশী হয় না। বুঝেছো ? যখন তখন খড়মপেটা, লাথি-ঝাঁটা, শাক-ভাত খাইয়ে রাখা, এসব অধর্ম কি সয় ? ও হলো লক্ষ্মীমন্ত ছেলে। যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই সোনা ফলছে। এই তো সীতেপুরের হাটের কাণ্ডখানা, সবাই জানে। তাস তুলতেই টেক্কা সাহেব বিবি। ওকে ভাড়িয়ে টাকা গুছিয়ে নিয়েছে জানো নিমাই ঘোষ ? ঝুলন সাধুর বাক্যও তো মিছে নয়।

যারা আড়ালে আবডালে ছিলো তারা সব আগু হয়ে এলো এবার। কী একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছে তারা। কী যেন সব কাণ্ডমাণ্ড হয়েছে।

পরাণ ধরা গলায় বলে, ও যে সে লোক নয় গো মা। আমরাই এতোকাল চিনতে পারিনি। নিমাই ঘোষ কি এমনি এমনি পাঁচ হাজার টাকা ঢালছে? ওর হাতের দশটা আঙুলে লক্ষ্মী ঠাকরুণ খেলা করলেন। ঝুলন সাধু তু বছর আগে বলে রেখেছিলো এরকম লোককে যে পাবে সে রাজা।

মা অবাক হয়ে বলে, বলিস কি? অমন হলে আমি আর টের পেতুম না? পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু কোলে কাঁখে নিয়ে মানুষ তো করেছি।

ছাই করেছো! নিজের চোখেই দেখেছি তো তোমার মানুষ করা। ছোঁড়াটাকে ইস্কুলে অবধি দাওনি পাছে কাজে ফাঁক পড়ে। ওসব অন্যের কাছে গল্প কোরো, এই পরাণ শর্মার কাছে নয়।

এ কথায় মা চুপসে গেল। আজ পরাণেরই দিন।

পরাণ রাগ থেকে হাহাকারে পৌঁছে গিয়ে বললো, অমন লোকটা তোমাদের দোষেই যদি হাতছাড়া হয় তাহলে আমি কাউকে আস্ত রাখবো ভেবেছো!

বুড়ো বাপের চোখ মিটমিট করছে। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা ঘাবড়ে। মা কেমন তোম্বাপানা, চোখে জল।

মা বললো, আমরা কি অতো জানতুম বাছা!

পরাণ বললো, নিমাই ঘোষ আজ পাঁচ হাজার দর নিয়ে গেল, তোমাদের বলে রাখছি, তু দিন বাদে পঞ্চাশ হাজার দর দিতেও আসবে। দামটা যা তোমরাই দিলে না।

এখন তাহলে করবি কী?

কপালে থাকলে তাকে ফিরিয়ে আনবো। জোত জমি সব তার নামে লেখাপড়া করে'দিতে হবে। সোনাদানা সব ফেরৎ দিতে হবে। খাওয়া থাকার ভালো ব্যবস্থা করে দিতে হাতে পায়ে ধরে বলতে হবে, ওরে, নিমাই ঘোষ নিতে এলে যাসনি বাপ, যা চাস তাই দেবো।

বাপ একবার ফুঁসে উঠলো, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না সেটা? খড়মপেটা খেয়ে মানুষ, তার কি অতো সইবে?

পেল্লায় একখানা হুংকার ছাড়লো, চোপ! আমার কথার ওপরে কথা কইলে খুব মুশকিল আছে বলে দিলাম। খড়ম তুলে এবার নিজের মুখে মারুন। এ বাড়িতে টিকে থাকতে হলে এবার থেকে বাঘের খোলস ছেড়ে ভেড়ার মতো থাকবেন।

পরাণ উঠে সাইকেলখানা টেনে বেরোতে যাচ্ছিল।

ও পরাণ, কোথা চললি?

যাচ্ছি খুঁজতে, পেলে ফিরবো, নয়তো আর এ মুখো হচ্ছি না।

বউ যে কেলেঙ্কারি করে গেল তার কী করবি?

সে মাগী যদি গোপালের সঙ্গে গিয়ে থাকে তো তার বাপের ভাগ্যি বর্তে গেছে।

পরাণ বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে খুব গণ্ডগোল উঠলো। নানাজনে একসঙ্গে কথা কইছে।

পরাণের বাপ মোড়া টেনে ধপ করে বসে পড়ে বললো, কিছুই যে ভালো করে বুঝলুম না।

পরাণের মা হাঁফ ধরা গলায় বলে, পরাণ বরাবর হিসেবী ছেলে। বেহিসেবী কিছু করবে না।

নেশাভাঙ করে আসেনি তো! লক্ষণ দেখলে কিছু?

চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছো? নেশা করে এলে আমি বিশ হাত দূর থেকে টের পাই, মায়ের চোখ সব দেখতে পায়।

তাহলে কী হলো?

সেইটেই তো বুঝবার চেষ্টা করছি। হাঁদাভোঁদা গোপাল রাতারাতি এমন বকধার্মিক হলো কী করে?

সেজো বউ টগর হঠাৎ এগিয়ে এসে বললো, ঝুলন সাধুর কথা কিন্তু আমি জানি। আমাদের পাশের গাঁ হরিপুরে বিষ্ণু পালের বাড়িতে এসেছিলো। মস্ত সাধু। বাক-সিদ্ধাই।

পরাণের বাপ কিছু না বলে মাথা নাড়লো।

পরাণের মা নিস্তেজ গলায় বলে, কী জানি বাপু, কথাটার মধ্যে কিছু সত্যিই থাকতে পারে। গোপাল তো মানুষটা খারাপ নয়। হাতটান নেই, লোভ নেই। চারটি খায়, মোষের মতো খাটে আর একধারে পড়ে থাকে।

পরাণের বাপ একটু রুখে উঠতে গিয়েও পেরে উঠলো না। নিমাই ঘোষ পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে আসছে গোপালকে, এটা যদি সত্যি হয় তবে ভাবনার কথা, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। পরাণের বাপ গিয়ে নিজের হাতে তামাক সেজে নিয়ে গোমড়া মুখে বসলো।

সাইকেলে উঠেই পরাণ বুদ্ধি খাটিয়ে ফেললো। তার বউ পালিয়ে গিয়ে উঠবে সেই নবাবগঞ্জের বাপের বাড়িতেই, মেয়েদের বাপের বাড়ি ছাড়া আর আছেটা কী? নবাবগঞ্জের বাস ধরতে হলে কাছে পিঠে একমাত্র সূতোহাটা। জোরে চালিয়ে গেলে এখনও সময়মতো সূতোহাটায় গিয়ে ওদের নাগাল পাওয়া যাবে। নাহলে নবাবগঞ্জেই ধাওয়া করতে হবে।

পরাণ প্রাণপণে সূতোহাটার দিকে সাইকেল চালিয়ে দিলো।

৫

মেয়েটার মুখখানা ভারী পছন্দ হলো বাসন্তীর। বললো, শোনো মেয়ে, এই বাপের ঘর আর করতে হবে না, নিমাই ঘোষের সঙ্গেও বিয়ে বসতে হবে না, আর গলায় দড়ি দেওয়ার জন্য ঢের দিন পড়ে আছে। তুমি আমার সঙ্গে আমার বাপের বাড়ি চলো।

ময়না ঠোঁট উল্টে বলে, সেখানে গিয়ে কী হবে? তোমার বাপের বাড়ি তো আর আমার বাপের বাড়ি নয়! সেও পরের বাড়ি। ঝি খাটাবে তো! সে এখানেও অনেকে খাটাতে চায়। শুধু পরেশ দাসের মান যাবে বলে সে কাজ করিনি। এখন আর ইচ্ছেও নেই। মরাই ভালো।

গোপাল মাথাটা খানিকক্ষণ খাটালো। কোনোও কথাই খেলছে না মাথায়। অনেকক্ষণ ভেবে বললো, ও দড়িতে হবে না।

ময়না অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পাটের দড়ি আমি খুব চিনি। ও দড়ি জলে ভিজে ভিজে একেবারে পলকা হয়ে গেছে। তিন চার জায়গায় জোড়া তাপ্পি দেওয়া। গলায় দিয়ে যদি ঝোলো তবে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে হাত-পা ভাঙবে। সেটা আরও কেলেং-কারি।

আর দড়ি নেই যে। নতুন দড়ি কেনার পয়সাও নেই। ধার দেবে?

দিলে ধার শোধ হবে কি করে? মরলে তো আর শোধ হবে না।

তুমি খুব সেয়ানা লোক।

লোকে তবু আমাকে বোকাই ভাবে।

তোমরা দুটিতে বেশ জুটেছো কিন্তু। বর-বউ নও, মনেই হয় না। খুব মিল বুঝি তোমাদের? মানুষের মিল দেখলে বড্ড ভালো লাগে। দাঁড়াও,

দাত্থ দোকান খুলছে মনে হয়। হুড়কো খোলার শব্দ। টাকাটা এনে দিই তোমার।

বুড়ো দরজা খোলা অবস্থায় ঠাকুর প্রণাম করছে, তার পাশ দিয়ে সট করে ঢুকে গেল মেয়েটা। আবার তেমনি ফুরুৎ করে বেরিয়ে এসে ভাঁজ-করা টাকা গোপালের হাতে দিয়ে বললো, গুণে দেখ, ঠিকঠাক আছে কি না। এক পয়সাও খরচ করিনি।

বাসন্তী আর একবার বললো, যাবে না তাহলে ?

না গো। আমার আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে যায় না। আর আজকের দিনটা তো শুধু। তারপর আর কষ্ট কিসের বলো।

দেরী করার উপায় নেই। বাস আসার সময় হয়ে এলো। গোপাল টাকাটা ট্যাকে গুঁজে উঠে পড়লো। বললো, আজকের দিনটা কিন্তু ভালো নয়।

মবার আবার দিন কী ?

সে আছে। ত্রিপাদ দোষ হয়। দোকানের বুড়ো মণ্ডলমশাইকে জিজ্ঞেস করে এসো না, পঞ্জিকায় লেখা আছে কি না।

লেখা আছে কিনা তা গোপালও জানে না। তবে ত্রিপাদ দোষ বলে একটা দোষের কথা শুনেছিলো গাঁয়ের চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে। সেটা মনে পড়ায় বলে দিলো।

কী হয় এদিন মরলে ?

এ দিনে মরলে মানুষ বাত্থড় হয়ে জন্মায়। আর জানো তো বাত্থড় মুখ দিয়ে হাগে !

অ্যাঃ। ওয়াক থুঃ ! ছিঃ ছিঃ, কী সব কথা !

যা বললাম ন্যায্য কথা। ভেবে দেখো। মুখ দিয়ে হাগা মোটেই ভালো নয়।

ওয়াক !

বাসন্তী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেললো, পারোও বটে বাপু তুমি

কথা বানাতে ! এমনিতে তো বোকা, এমনিতে—

চলো বউঠান। আর দেরী করলে বাস চলে যাবে। আসি গো ময়নামতি।

ময়না জবাব দিলো না। তবে কেমন গোঁজ হয়ে চেয়ে রইলো।

হাঁটতে, হাঁটতে বাসন্তী বলে, বেশ মেয়েটা গো। আমার দিব্যি রইলো, তুমি আমাকে বাসে তুলে দিয়ে ওকে একটু মুড়িটুড়ি কিনে দিয়ে যেও।

কী দরকার ! লোকে কুকথা ভাববে।

তোমার মায়াদয়া নেই। অতো পাষাণ কেন গো তুমি ?

মায়া করে লাভ কী বলো ! মরণ এর কপালে লেখাই আছে।

তা কেন ? আমি যদি তুমি হতুম তবে বলতুম, মোরোনা, আমি তোমাকে বিয়ে করবো। কেমন ঢলঢলে মুখখানি, আর কী বড় বড় টানা চোখ, মাথার চুল দেখেছো ! ভালো ঘরে জন্মালে এ মেয়ে পড়তে পায় ?

আমি অত দেখিনি।

করবে বিয়ে গোপাল ? করোই না। তোমার যা বিপদ যাচ্ছে তার বেশী আর কী হবে বলো !

গোপাল মাথা চুলকে বললো, ইচ্ছে যে যায় না তা নয়। তবে সাহস হয় না।

মেয়েটা যদি মরে বড় দুঃখ পাবো।

আজ মরবে না। ভয় খেয়েছে।

বাসরাস্তায় এসে সবে দুজনে দাঁড়িয়েছে, ঠিক এমন সময় পুবধার থেকে পাঁই পাঁই করে একটা সাইকেল আসতে দেখা গেল। বড্ড জোরে চালাচ্ছে।

হঠাৎ বাসন্তী গোপালের হাত চেপে ধরে বললো, দেখেছো ? হয়ে গেল।

কী বলো তো !

ওই আসছে।

গোপালও দেখলো। সাইকেলটা কাছেই এসে পড়েছে। সীটে মূর্তিমান পরাণ।

গোপাল বাসন্তীকে একটু টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও।

আর তুমি মার খাবে বুঝি ?

পরাণদাদার গায়ে তেমন জোর নেই। কিলটা চড়টা হজম করতে পারব। আর আমাকে আগে একহাত মেরে নিলে হেদিয়ে পড়বে। তোমাকে আর তেমন মারতে পারবে না। যাও।

বাসন্তী বুকে ঢিপঢিপ নিয়ে একটু তফাৎ হলো।

পরাণ ধড়াস করে সাইকেলটা ফেলে তেড়ে এলো প্রায়।

গোপাল মার ঠেকাতে হাত তুলেছিলো। কিন্তু পরাণদাদার আজ কী হলো, সোজা এসে পায়ের ওপর পড়লো। পা দুখানা জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলে বললো, গোপাল, মাপ করে দে ভাই। তোকে চিনতে পারিনি রে। তুই গেলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যাবে। যা চাস সব দেবো। জমিজিরেত ফেরৎ পাবি, গয়না পাবি, আদর যত্ন পাবি, আর যে শালা তোর গায়ে হাত তুলবে তার হাত আমি নিজে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেবো···

গোপাল তাড়াতাড়ি পরাণকে টেনে তুললো, করো কী পরাণদাদা, পাপ হয়ে যাচ্ছে যে···

তার চেয়ে ঢের বেশী পাপ আমরা করেছি রে। কাল তোকে কিনতে আসবে নিমাই ঘোষ, যাসনি দাদা, তোর পায়ে পড়ি···

কথাগুলো বুঝে উঠতে বিস্তর সময় লাগলো গোপালের। বাসন্তীরও। তবে শেষ অবধি বোঝা গেল। গোপালকে ফেরৎ চায় পরাণদাদা !

বুদ্ধিটা হঠাৎই যেন একটু ঝিকমিকিয়ে উঠছে এখন গোপালের। সে বুঝে গেল, পয়মন্ত বলেই তার এত খাতির। সে গলা সাফ করে বলে, ঘরের লক্ষ্মী যে-বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সে বাড়িতে ফিরে যাওয়া কি আমার উচিত হবে পরাণদাদা ? ওই দেখ তোমার বউ পুঁটুলি বগলে দাঁড়িয়ে···

কোন্ গুখোরের ব্যাটা আর ওর গায়ে হাত তোলেরে! এই নাক মলছি, কান মলছি।

ফেরৎ নেবে?

একশবার নেবো।

ফাঁক বুঝে বাসন্তী গুটি গুটি এগিয়ে এলো। পাপচোখে যা দেখছে তা ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না। রাতারাতি কি কলিযুগ উল্টে সত্যযুগ পড়ে গেল নাকি? পরাণের মারেরদাগ এখনও যে তার শরীরময়। শুকনো গলায় সে বললো, আমি যাচ্ছি না বাবা, খুব হয়েছে বরের ঘর করা। আর নয়…

অভ্যাসবশে পরাণ ঝ্যাঁক মেরে উঠতে যাচ্ছিলো, তবে রে…

পরমুহূর্তেই অবশ্য সামলে গেল। দেঁতো হাসি হেসে বললো, বরের ঘর ছাড়া মেয়েদের আর গতি আছে?

বাসন্তী ঝামরে উঠলো, খুব আছে। নবাবগঞ্জে আমার বাপের বাড়িতে কতো ঘরদোর, কতো জমিজিরেত…

পরাণ মিটমিটি চেয়ে, বাসন্তীকে খুন করার ইচ্ছেটা চেপে রেখে, মোলায়েম গলাতেই বললো, বাপের বাড়ি দেখাচ্ছিস বউ? পৃথিবীতে লাখো লাখো মানুষের সবকটা মরে গেলেও তুই বিধবা হবি না, কিন্তু এই শর্মা যদি মরে তবে তুই বিধবা। বুঝলি? এই শর্মা…বলে ভারী বরাই করে বুক চিতিয়ে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললো পরাণ।

'বিধবা' কথাটা শুনেই জিব কেটে কানে আঙুল দিলো বাসন্তী। নতুন বিয়ের বউ, এখনও 'বিধবা' কথাটা সইতে পারে না। তারপর বললো, শ্বশুর কী বলেছে জানো? রতন মান্নাকে দিয়ে খুন করাবে। আমার শুনে বড্ড ভয় হয়েছে সেই থেকে। সাধে পালাচ্ছি?

পরাণ তেমনি বুক চিতিয়ে বললো, আজ সকালে বুড়োর বিষদাঁত উপড়ে দিয়ে এসেছি না? চোখ রাঙাতে এসেছিলো, এমন ধামকি দিয়েছি যে, কাপড়ে মুতে ফেলার জোগাড়। বলে দিয়ে এসেছি আজ থেকে বাড়ির

কর্তা আমি। আমার কথায় সব চলবে।

একথায় বাসন্তীর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো, মা শীতলার দিব্যি করে বলছো তো!

তা নয় তো কী?

তাহলে আমার আর একটা কথা আছে।

কী কথা?

বলো রাখবে! নইলে ওই নবাবগঞ্জের বাস আসছে কিন্তু...

বল না মাগী।

বলছিলুম কি, এ গাঁয়ের একটা মেয়েকে আমার গোপালের জন্য খুব পছন্দ। দুঃখী মেয়ে। গলায় দড়ি দেবে বলে বসে আছে। তাকে সঙ্গে নিতে দেবে? আমি গোপালের সঙ্গে তার বিয়ে দেবো।

বিয়ে! বলে পরাণ কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলো। তারপর হঠাৎ তার মাথায় মতলবটা চিড়িক দিয়ে উঠলো। কাল নিমাই ঘোষ যখন ট্যাকে টাকা গুঁজে সঙ্গে রতন গুণ্ডাকে নিয়ে আসবে তখন যদি দেখে যে, গোপালের বিয়ে হচ্ছে, তাহলে আর বাছাধন ট্যা ফোঁ করতে পারবে না। বেজায় সস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছিলো গোপাল। বিয়ে দিলে আপাতত ঠেকানো যায়?

এক গাল হেসে পরাণ বললো, কাল বিয়ের তারিখ আছে? না থাকলেও মূল্য ধরে দিলেই হবে। চল শালা, কালই বিয়ে দেবো।

লজ্জায় গোপাল অধোবদন।

ধুলো উড়িয়ে বাসটা গাঁক গাঁক করে এসে থামলো। ফাঁকা বাস। কণ্ডাক্টর তাদের দিকে চেয়ে বিস্তার চিল্লামিল্লি করছিলো। কেউ ফিরেও তাকালো না বাসের দিকে।

হতাশ হয়ে বাসটা ঘণ্টি বাজিয়ে চলে গেল।

বাঘু মান্নার·বরাত

১

বাঘু মান্নাকে কেন যে গোঁসাইপুরের লোকেরা বাঙাল বলে তা বাঘু বুঝে উঠতে পারে না। বাঘুর বাড়ি হলো খন্যান, সেই হুগলি জেলা। নিকষ্যি ঘটি। শ্বশুরবাড়ি পীরগঞ্জে। সেও ঘটিস্য ঘটি দেশ। তবে কিনা গোঁসাই-পুরের লোকেদের ধারণা, এ জায়গা ছাড়া আর সব জায়গাই হচ্ছে বাঙাল দেশ। গোঁসাইপুর জায়গাটাকে বুঝে নিতে একটু সময় লেগেছিলো বাঘুর। জন্ম-বয়সে সে তো আর বিদেশ-বিভুঁই যায়নি। খন্যানের রেল স্টেশনটা অবধি চোখে দেখেনি এই সেদিন অবধি। তারপর বিয়ে করতে যখন পীর-গঞ্জে গেল তখন বেশ দূরেই যাওয়া হলো তার। সেই বীরভূম। তারপর মাসী শাশুড়ির সম্পত্তির গন্ধ পেয়ে এই গোঁসাইপুর।

বিয়ে করলো পীরগঞ্জের গেরস্তঘরে। অবস্থা কিছু ভালো নয়। একখানা সাইকেল দিতেই শ্বশুরের মুখখানা তেলোহাঁড়ি হলো। গাঁ-ঘরে সাইকেল দেওয়াটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে, চাইতে হয় না। কিন্তু ফেরেববাজ শ্বশুর সেটাও চেপে যেতে চেয়েছিলো। পরে চেয়েচিন্তে আদায় করতে হয়। তবে, খামতি যা ছিলো তা হাঁকডাকে পুষিয়ে দিতো শ্বশুর। কালেভদ্রে গেলে কোমরের কষি বাঁধতে বাঁধতে উঠে দাঁড়িয়ে ভিতর বাড়ির দিকে হাঁক মারতো, ওরে জামাই এয়েছে, পুকুরে জাল ফ্যাল জাল ফ্যাল। তা জাল ফেলা হতো কি না কে জানে, কিন্তু খাওয়ার পাতে চুনোপুঁটিই বরাদ্দ ছিলো। পরে শুনেছে, জাল ফেলার ব্যাপারটাও ফেরেববাজি, তাদের মোটে পুকুরই নেই।

বাঘু পাত্র হিসেবে জুতের নয়। তার বাপ-মাও ধরে নিয়েছিলো, এ ছেলের গতিক সুবিধের হচ্ছে না। বাঘুরা সাত ভাই। বড় দু'জন ডাকাবুকো,

বিষয়ী। বাঘু তাদের মতো নয়। তার ওপর অল্পবয়সেই কুসঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ ধরে ফেলেছিলো। একে একে ছ'ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বাঘু তখন বাইশ-তেইশ বছরের জোয়ান। নেশা করে এখানে সেখানে পড়ে থাকে। তারই মধ্যে একদিন ভাইরা গিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে পুকুরে চুবিয়ে মাথায় টোপর পরিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে চললো বিয়ে দিতে! কিছু ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। বউয়ের নাম শুনলো, ময়না। বিয়ে ব্যাপারটা মন্দ না বাঘুর। লোকজন, আলো রোশনাই, বাদ্যি বাজনা, খাওয়া দাওয়া, দেওয়া থোওয়া, হাসি মস্করা সব মিলিয়ে জম্পেশ ব্যাপার। তবে কে পাত্রী ঠিক করলো, কবে বিয়ে তারিখ হলো এসব সে জানেও না। বেশি জানার দরকারই বা কী? বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরবাসী করার মতলব ছিলো বাড়ির লোকের। কিন্তু ময়নাকে নিয়েই বাধলো গোল। ছ মাসের মাথায় সে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠলো। সেখান থেকেই খবর পাঠালো, শ্বশুরঘর করতে তার বয়েই গেছে।

এরকমধারা যে হবে তা বাঘুর বাড়ির লোক একরকম ধরেই নিয়েছিলো। তাদের না আছে পয়সার জোর, না ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ। ছ মাসের মধ্যে ছ দিনও বউয়ের সঙ্গে রাত কাটায়নি বাঘু। তা বলে হম্বি-তম্বি করতে ছাড়েনি বাঘুর বাপ-ভাইরা। বাঘুর অবশ্য তাপ-উত্তাপ কিছু ছিলো না। তার তো মজার অভাব নেই। এখানে সেখানে মদের ঠেক, নেশার দেদার ব্যবস্থা। ময়নার অভাব সে টেরও পেলো না। তবে বাপ ভাই মা আর বউদিদিদের গঞ্জনায় তাকেও মাঝে মধ্যে ঝগড়া করতে শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো। কিন্তু ময়না মোটেই দেখাই করতো না তার সঙ্গে। গাঁ-ঘরে এমন তেজালো মেয়ে বড়ো একটা দেখা যায় না। ময়নাকে আনা তো গেলই না, উপরন্তু সে গোঁসাইপুরের মাসীর আস্কারা পেয়ে একদিন সোজা চলে গেল মাসীর কাছে। ভারী তেজালো মাসী। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখে সেখানে আরও দুই সতীন মজুত। মাসী সোজা

একবস্ত্রে বেরিয়ে এসে পড়লো। তারপর ভারী কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে মাস্টারি জুটিয়ে নিজের ভার নিজেই নিলো। জোতজমি করলো, ঘর তুললো, নানা কাজে জড়িয়ে পড়লো। লীলাময়ীর ভারী নামডাক এদিকে। পতিত উদ্ধার করে বেড়ায়, মেয়েদের উসকে দেয়। পুরুষরা ছিলো তার চোখের বিষ। মাসী ময়নাকে নিজের কাছে শুধু রেখেই দিলো না, বিয়ে ছাটকাট করার জন্য উকিলও লাগালো। বললো, ময়নার আমি আবার বিয়ে দেবো। একটা হাঘরে মোদো মাতাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বেড়াল পার করেছে ওর বাপ, আমি ও বিয়ে মানি না।

বিয়ে হয়েও তাই বাঘু একলা একলাই রয়ে গেল। লীলাময়ীর থানে এসে হুজ্জুত করার সাহস ছিলো না, প্রয়োজনও ছিলো না। বাঘু বউ দিয়ে করবেটা কী? বরং ঝামেলা বাড়ানো। দিব্যি হেসেখেলে দিন কেটে যাচ্ছে।

অসুবিধেটা দেখা দিলো বাপ মরার পরই। ভাইরা সব জোতজমি ভাগ বাটোয়ারা করে ভিন্ন হলো। এক একজনের ভাগে যা পড়লো তা আতস কাঁচ দিয়ে দেখতে হয়। মিলেজুলে যখন ছিলো তখন একরকম চলে যেত। ভিন্ন হওয়ার পর হাঁড়ির হাল। তবু দু ভাই বিষয়ী এবং খাটিয়ে বলে সামলে গেল, বিপদে পড়লো বাঘু। একদিন চটকা ভেঙে বুঝল, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়।

নেশাভাঙের কথা দূরে থাক, দুবেলা দু মুঠো ভাতই জুটতো না তখন। দাদারা কুকুর তাড়া করে দূরে রাখে। ইয়ারবন্ধুরা পরামর্শ দিলো, একবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখ যদি কিছু হয়।

ততদিনে বাঘু ময়নার মুখটাও ভুলে গেছে। তবু গেল। শ্বশুরমশাই যথারীতি পুকুরে জাল ফেলার জন্য হাঁকাহাঁকি করলেন এবং শাশুড়ি পুঁটিমাছ দিয়ে ভাত খাওয়ালেন। বিকেলবেলার দিকে মুড়ি আর ফুট-কড়াই ভাজা দিয়ে জলখাবার খেয়ে সে একটা ঢেঁকুর তুলে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কথাটা পেড়ে ফেললো। তেমন মন্দ কথাও নয়। সে এখন ঘরজামাই

থাকতে চায়।

দুনিয়ায় কত শ্বশুর আছে যারা জামাইয়ের কাছ থেকে এহেন প্রস্তাব পেয়ে বগলে চাঁদ পাওয়ার মতো আহ্লাদে আটখানা হতেন। কিন্তু এই শ্বশুর আঁতকে উঠে বললেন, ঘরজামাই! বলো কী হে! ময়না এখন তার মাসীর হেফাজতে। তোমার সঙ্গে একটা নামমাত্র বিয়ে হয়েছিলো বটে, তা সে তো কোর্টকাছারি করে লীলাময়ী ছাড়ান কাটান করে ফেলেছে। লীলাময়ী ময়নার আবার বিয়ে দেবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুমি এখন আর আমার জামাই-ই তো নও, ঘরজামাই তো দূরের কথা।

ছাড়ান-কাটান যে হয়ে গেছে তাও জানত না বাঘু। শুনলো, একতরফা হয়ে গেছে। উকিলের চিঠি, আদালতের নোটিশ সবই নাকি জারি হয়েছিলো বাঘুর নামে। হবে। তার বাড়িতে কে আর অত খতিয়ে দেখেছে। তবে ভারী দমে গেল বাঘু। এখন উপায়?

শ্বশুরমশাই একটু চাপা গলায় বললেন, আমরা সেকেলে লোক। তাই জামাই বলে তোমাকে খাতিরযত্ন করছি বাবা। নইলে তুমি এ বাড়ির পরস্য পর। আর একটা কথা, লীলাময়ীর কাছে হুট করে গিয়ে হাজির হয়ো না। জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। হাতে ষণ্ডাগুণ্ডা আছে।

বাঘু মলিন মুখে গাঁয়ে ফিরে এলো। মুখ দেখেই স্যাঙাতরা বুঝলো, মাল আবার ঘাড়ে চাপতে এসেছে। সবচেয়ে ঘড়েল লোকটি হলো শিবপদ। সে পরামর্শ দিলো, শোনো বাঘু, মরণ তো একবারই। যাও গিয়ে গোঁসাইপুরেই হানা দাও। শত হলেও সাত পাকে বাঁধা বউ, ফেলবে না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে। তা করুক। কে-ই বা তোমাকে মান্যিগণ্যি করছে বলো। প্রাণ আগে না মান আগে? তবে বেশি আইন টাইন বা গায়ের জোর দেখিও না। শুধু মোলায়েম করে মাসীকে বলবে, কাজটা কি ভালো হচ্ছে? সধবার বিয়ে দেওয়াটা উচিত হচ্ছে না।

বাঘু প্রথমটায় রাজি হলো না। তার ভারী ভয় করছিলো। ময়নার মুখটাও যে তার মনে নেই। শ্বশুরমশাই গুণ্ডার ভয়ও দেখিয়ে রেখেছেন। লীলা-

ময়ী ভারী গেছো মেয়েছেলে। কেন যে লোকের ওরকম মাসী থাকে তা কে জানে। আর জুটলো এসে তারই কপালে।

বাঘু খন্যানে কিছুকাল কষ্টেসিষ্টে রইলো। নেশাভাঙ ছুটে গেছে খিদের জ্বালায়। স্যাঙাতরা আর চিনতেও চায় না, দাদারা দূরছাই করে। বাঘু একদিন গভীর রাতে পেটে খিদে নিয়ে বসে গম্ভীরভাবে ভাবলো। ভেবে দেখলো, মরা তার বরাদ্দ আছে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না। ববাত ঠুকে একবার গোঁসাইপুর হাজির হয়ে দেখিই না কী হয়।

ভোর না হতেই বাঘু রওনা দিলো। ভয়ে, অনিশ্চয়তায়, খিদেয় যখন আধ মরা হয়ে পৌঁছোলো তখন নতুন জায়গায় পৌঁছোনোর পক্ষে সময়টাকে ভালো বলা যায় না, ভরসন্ধে, রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই না জুটলে বড়ই মুস্কিল। তবে বাঘুর একটা সুবিধে আছে, মদ ভাঙ গাঁজা যা হোক চড়িয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকলেই হবে।

বেশি খুঁজতে হলো না, যাকে লীলাময়ীর নাম বলে সে-ই ভারী খাতির করে পথ দেখিয়ে দেয়। পৌঁছে দেখে, একতলা দিব্যি পাকাবাড়ি। সামনে বাগান। অনেকবার আগু পিছু করে এবং অনেক ভেবেচিন্তে বাঘু শুধু কয়েকবাব গলা খাঁকারি দিতে পারলো। তার বেশি আর মুরোদে কুলোলো না।

তবে কিনা বেশিক্ষণ আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হলো না। লীলাময়ীর বাড়িতে অনেকের যাতায়াত। বিশেষ করে মেয়েছেলেদের। তাদেরই একজন তাকে আগাপাশতলা চোখের নজরে জরিপ করে নিয়ে বললো, অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে কী মতলবে?

আজ্ঞে এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।

শ্বশুরবাড়ি! এ তো লীলামাসীর আশ্রম।

আজ্ঞে তিনি আমার মাসীশাশুড়ি।

বললেই হলো।

ধর্মতই বলছি, বছর দুই আগে ময়নার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো।

একথায় মেয়েছেলেটি এমন চোখ করে তার দিকে তাকালো যে বাঘুর রক্ত জল হয়ে যেতে লাগলো। তারপরই মেয়েটা বিকট গলায় বললো, ওঃ তুমিই সে-ই বদমাশ ! তুমিই সেই মাতাল ! হাড় হাভাতে বউঠ্যাঙানো বীর ! ময়নার জীবনটা তুমিই মাটি করেছো তাহলে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা···

তারপর এমন চিল-চ্যাঁচানি চ্যাঁচাতে লাগলো যে লহমায় লোক জড়ো হয়ে গেল চারদিকে। বাঘুর তখন পালানোর পথ নেই। টালুমালু হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে আর শুকনো মুখে ঢোঁক গেলার চেষ্টা করছে।

গোলমালে ময়না আর তার সাঙ্ঘাতিক মাসীও বেরিয়ে এল। ঘটনাটা বুঝে উঠতে এবং বাঘুকে চিনতে একটু সময় লাগলো তাদের। তবে মাসী ঘটে কিছু বুদ্ধি ধরেন। বাঘুর বিচারটা পথের ওপর না করে ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে বাঘুকে মেঝের ওপর নিলডাউন করিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মতলব কী ?

বাঘু তখন চিঁ চিঁ করছে। হাত জোড় করে বললো, বদ মতলব কিছু নেই। না খেতে পেয়ে মরতে বসেছি, শেষ দেখা দেখতে এলাম।

তাতে চিঁড়ে ভিজলো না। মাসীর সন্দেহ বাঘু ময়নার বিয়েতে বাগড়া দিতে এসেছে।

বাঘু মাথা নেড়ে বললো, ওরকম কথা ভাবাও পাপ, ধর্মত বলছি ময়নার বিয়েতে আমি ঘাড়ে করে সাত পাকের পিঁড়ি ঘুরিয়ে দেবো।

অনেক রাত অবধি তাকে নিয়ে নানা কথা আলোচনা হলো। ময়না অবশ্য সামনে এলো না, আর বাঘু খিদে তেষ্টা পরিশ্রমে বসে বসে ঢুলতে লাগলো। এত ভ্যাজরাং ভ্যাজরাং তার ভালো লাগছিলো না।

রাত এগারোটা নাগাদ মাসী তাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, আজ রাতের মতো বারান্দায় পড়ে থাকো। কাল সকালে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। নইলে বিপদ আছে।

বাঘু ভারী মুষড়ে পড়লো। কোথায় যে যাবে তা-ই বুঝতে পারছে না। খেতে টেতেও দিলো না এরা। রাতে বাঘু খালি পেটে ঠাণ্ডার মধ্যে

বারান্দায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোলো বটে, কিন্তু মাঝরাতেই কাঁপিয়ে জ্বর এল। সকালে দেখা গেল, জ্বরের তাড়সে ভুল বকছে। সেই অবস্থায় হাসপাতালে চালান দেওয়া হলো তাকে। সেখানে মেঝের ওপর কম্বলের বিছানায় ফেলে রাখলো। চারিদিকে গু-মুত, কুকুর-বেড়াল, ছুঁচো-ইঁদুর, টপাটপ রুগীরা টসকে যাচ্ছে। সে এক বিভীষিকা। বাঘু জ্বর নিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে পালানোর তালে ছিলো। হলো না। সিঁড়ি থেকে পড়ে চোট হয়ে গেল মাথায়। তবে দিন সাতেক বাদে তার জ্বর ছাড়লো। মাথার চোটটাও আর তেমন টের পাচ্ছিলো না। একদিন সকালবেলা তার যখন পরিপূর্ণ জ্ঞান হলো তখন চারদিককার নরকটাকে ভালো করে চেয়ে দেখলো সে। মানুষে আর পশুতে কোনো তফাত নেই। জীবনে কোনো ভালো কাজ করেনি সে! বড়ো দুঃখ হলো নিজের জন্য। সে উঠে চারদিক ঘুরে টুরে দেখে এক গাছা ঝাঁটা আর বালতি জোগাড় করে আনলো। হাসপাতালটা মোটেই বড় নয়। দু'খানা মোটে ওয়ার্ড। ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় সে গোটা জায়গাটা সাফ করে ফেললো। ফিনাইলের বোতল ছিল না, ব্লিচিং পাউডার ছিলো। তাই লাগালো। রুগীরা ভারী অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তাকে। আর এই যে সবাই তাকে দেখছে এটা ভারী নেশার মতো পেয়ে বসলো তাকে। বাঘু সকাল-বিকেল নিজে থেকেই হাসপাতাল সাফাই চালিয়ে যেতে লাগলো। তিন দিন বাদে হাস-পাতালের ধাঙড়রা এসে ধরলো তাকে। প্রথমে হম্বি তম্বি তারপর অশ্রাব্য গালাগাল, তারপর মারধর। বাঘু যে-কাজ করেছে তাতে নাকি তাদের চাকরি যাওয়ার ভয় দেখা দিয়েছে। মার খেয়ে বাঘু আবার শয্যা নিল। তবে হাসপাতালে নয়, বাইরের রাস্তায়। কাজটা বাঘু তো খারাপ করেনি। রুগীরাও দেখেছে তা। তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও সাক্ষী। সুতরাং ব্যাপারটা অনেক দূর গড়ালো। এক দল লোক এসে বাঘুকে তুলে ফের হাসপাতালে ভর্তি করালো। তারপর বেধড়ক ঠ্যাঙালো ধাঙড়দের। সে অ্যাইসা ঠ্যাঙানি যে হাড় গোড় সব দ হয়ে গেল। যাই হোক এই

ঘটনায় বাঘুর নামটা বেশ ছড়ালো। বাঘেন্দ্র মান্না যে লোকের উপকার করতে ভালবাসে এবং নামে বাঘা হলেও যে সে হালুম-বাঘা নয় তাও সবাই স্বীকার করে নিল।

কিন্তু হাসপাতাল তো আর বাসাবাড়ি নয়, চিরকাল সেখানে থাকাও যায় না। দিন পনেরো বাদে তার ছুটি হয়ে যেতে সে ফের চোখে সর্ষে-ফুল দেখতে লাগলো।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাঘু রাস্তায় এসে পড়লো, চারদিকেই নানা রাস্তা নানা দিকে গেছে। কিন্তু বাঘুর মুস্কিল হলো তার কোথাও যাওয়ার নেই। শীতের সকালে ফুরফুরে রোদে কত লোক হাঁটা-চলা করছে, বাজার যাচ্ছে, বাড়ি যাচ্ছে, কাজে যাচ্ছে, খোকাখুকিরা ইস্কুল-কলেজে যাচ্ছে। বাঘু তৃষিত নয়নে চেয়ে রইলো। অমনধারা তারও কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে।

গোসাঁইপুর অজগাঁ নয়, বরং বেশ ফাঁদালো গঞ্জ জায়গা। মাইল তিনেক দূরেই মহকুমা শহর। গোসাঁইপুরেও শহরের বেশ ছাপ আছে। হরবখত রিক্সা চলছে রাস্তায়, সাঁ করে মোটরগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, সাইকেলও মেলা। দোকানপাটও বেশ জমজমাট। রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে গোসাঁইপুর জায়গাটাকে বুঝবার চেষ্টা করতে করতে বাঘু পেটে খিদের ডাক শুনতে পায়। পিত্তি পড়ে জিব তেতো। গালে দাড়ি কুটকুট করছে, মাথা খাচ্ছে উকুনে। কিন্তু সেগুলো কোনোও অসু-বিধে নয়, সমস্যা হলো, বাঘু এখন করে কী? যায়ই বা কোথায়? তার হলো নেশাখোরের মাথা, বেশি বুদ্ধি টুদ্ধি খেলে না। নেশার ঘোরে আয়ুক্ষয় হয়েছে, ভগবান যে হাত পা চোখ মগজ দিয়ে রেখেছেন তার ব্যবহারই হলো না ভালো করে।

মাঝবয়সী রোগা একজন মানুষ দুটো ভারী থলে দু হাতে টেনে নিয়ে যেতে হিমসিম খাচ্ছিলো। বাঘুর কী মনে হলো, করারও তো কিছু নেই তার, টপ করে উঠে গিয়ে একটা থলে ধরে বললো, দিন আমি পৌঁছে

দিয়ে আসছি।

লোকটা রগচটা। খ্যাঁক করে উঠলো: বয়ে দেবে মানে? ইয়ার্কি নাকি?

লোকটা কৃপণই হবে আন্দাজ করে বাঘু বললো, পয়সা লাগবে না। এমনি দিয়ে আসছি চলুন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট লোকটার বাস্তবিক হচ্ছিলও। গজগজ করে বললো, চালের কথাটা আগে বললেও পারত তো মাগী। তাহলে আজ বগলাটাকে আর কাছারি পাঠাতুম না।

কাকে বললো কে জানে। মানুষ একা একা কত কথা বলে। তবে শেষ অবধি থলে দুটো বাঘুর হাতে দিয়ে লোকটা পিছু পিছু আসতে লাগলো। সাবধানী মানুষ, বাঘু যাতে পালাতে না পারে তাই চোখে চোখে রাখছে।

পালানোর কথাই ওঠে না। দশ সের চাল আর পাঁচ সাত সের বাজারের থলে নিয়ে উপোসী শরীরে পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। হাসপাতাল থেকে সদ্য বেরিয়েছে বাঘু, বোঝা টানতে তার জিব বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তবে পরের উপকার করার একটা নেশা আছে। যখন ঝোঁকটা চাপে তখন অন্যদিকে খেয়াল থাকে না।

লোকটা কেমন তা তখনও জানে না বাঘু। তবে কিপটে, তাতে সন্দেহ নেই। একটু রগচটা গোছেরও। লোকটা যেমনই হোক, তার গিন্নী ভালো মানুষ। বেশ আহ্লাদী গোলগাল চেহারার মেয়েছেলে। বাঘু বোঝা দুটো নামানোর পর যখন হাঁপাচ্ছে তখন গিন্নী বেরিয়ে এসে বললো, এ আবার কাকে নিয়ে এলে গো!

রাস্তার লোক। বলে লোকটা বাঘুর দিকে ফিরে সন্দিহান গলায় বললো, চার আনা পয়সা দিচ্ছি, এর বেশি কিন্তু এখানকার রেট নয়।

পয়সা নিলে পরোপকারের আর মজাটা কী? বাঘু দম নিতে নিতে হাতজোড় করে বললো, কিছু লাগবে না। একটু খাওয়ার জল পেলেই হবে।

একেবারে কিছুই নয়?

আজ্ঞে না। আমি মুটে নই। আপনার কষ্ট হচ্ছিলো, তাই—

লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পয়সা ছাড়া যে দুনিয়ায় কোনোও কাজ হয় তা তার ধারণাই ছিলো না। বিশেষ করে এই কলিযুগে। লোকটা সিকিটা রেখে মানিব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে ফেললো। তারপর বাঘুকে ভালো করে দেখে আধুলিটাও দিতে সাহস হলো না তার। সেটাও খুচরোর খোপে ফের ভরে রাখলো।

গিন্নী জল দিলেন, সঙ্গে দু খানা রুটি আর তরকারি। বাঘু সেটা আর ফেরাতে পারলো না। পেটে দুটো বাঘ আঁচড়া-আঁচড়ি করতে লেগেছে। খেতে বসিয়ে গিন্নীরা কথা আদায় করেন। ইনিও করলেন। তবে বাঘুর লুকোছাপা করার কিছু নেই। সব বৃত্তান্ত বলে দিলো।

গিন্নী বেশি কিছু বললেন না, শুধু বললেন, দুপুরেও তুমি এখানেই দুটি খেও বাবা। আর শোনো যার মাল বয়ে এনেছো তিনি হলেন ডাকসাইটে যতীন উকিল, তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। লীলাময়ীকে আমি খুব চিনি। আমার ভাইঝি টেঁপিটার কপাল তো ভাঙলো ওই লীলাময়ীই। কী না বর নাকি বুড়ো! তা চল্লিশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ বুড়ো হয় এই প্রথম শুনলুম।

বাঘু মাথা নেড়ে বললো, হিল্লে আর হওয়ার নয়।

ময়না তোমার কেমনধারা বউ? পালিয়েই বা এলো কেন?

বাঘুর এইটেই সমস্যা। ময়নার সঙ্গে তার আলো-বাদ্যি-মন্ত্রপড়া করে বিয়ে হয়েছিলো বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হয়নি। কাজেই ময়নাকে বউ বলে দাবি করাটা একটু বাড়াবাড়িই হতো তার পক্ষে, দাবি-দাওয়া তোলেওনি সে। মাথা চুলকে বাঘু বললো, আজ্ঞে সে এক বৃত্তান্ত, তবে বউ আর বলি কি করে? শুনছি ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে। ময়নার আবার বিয়ে।

তা শুনেছি। কিন্তু পালিয়ে এলো কেন? মারধর করতে নাকি?

জিব কেটে বাঘু বললো, কী যে বলেন! মারধর নয়। পালিয়ে এসে কাজটাও ময়না ভালোই করেছিলো। আমি কি একটা মানুষ ছিলুম মা?

চৌপর দিন মদ গিলে পড়ে থাকতুম, নেশার ঘোরে দিনরাত কখন পার হয়ে যেতো। মাথার ওপর বাপ ছিলো বলে ঠেলাটা টের পাইনি তখন। এখন পাচ্ছি।

ও বাবা, নেশা এখনও আছে নাকি?

মাথা নেড়ে বাঘু দুঃখের সঙ্গে বললো, ভাতই জুটছে না তো নেশা।

তোমার বয়স তো এখনও কম, এই বয়সে নেশা করতে কেন?

আজ্ঞে ঠিক বলতে পারবো না, আমার মাথাটায় এখনও তেমন করে কিছু বসছে না, সবটাই কেমন ধাঁধার মতো লাগছে।

আহা রে।

বাঘু দুপুরে ভরপেট ভাত খেয়ে টানা একখানা ঘুম দিয়ে যখন উঠলো তখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে। খানিকক্ষণ পড়ন্ত বেলায় হাঁ করে দুনিয়াটা দেখলো। সামনেই রাস্তা। লোকজন যাতায়াত করছে। পুরুষ মানুষেরা বউ নিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। আহ্লাদ খসে পড়ছে মুখে চোখে। বাঘু এতো আহ্লাদের ছবি আগে দেখেনি। কয়েকবার হাই তুলে বসে বসে সে ভাবলো, দুনিয়াটার কাছে আমার চাওয়ার আছেটা কী?

অনেক ভেবে দেখলো, নাঃ, চাওয়ার আর তার কিচ্ছুটি নেই। এমনকি আজ রাতে সে যদি মরেও যায় তাহলেও হয়। কিছু যায় আসে না।

সন্ধেবেলা যতীনবাবু ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বললেন, এখানে পাকাপাকি থাকাটের ব্যবস্থা হয়ে গেল বলে ভেবো না কিন্তু। আমি খুব হিসেবী লোক।

বাঘু লজ্জার সঙ্গে মাথা নামিয়ে বললো, আজ্ঞে সেটা আজ সকালেই বুঝে গেছি।

আজকের রাতটা থাকো। কাল অন্য ব্যবস্থা করে নিও।

যে আজ্ঞে।

এবার তোমার বৃত্তান্তটা বলো তো শুনি। গিন্নীর কাছে খানিক শুনেছি।

-বাঘু বললো, কিছু রাখঢাক করলো না। উকিলের জেরা বলেও কথা।
যতীনবাবু নড়ে চড়ে বসে শেয়ালের মতো একটু হাসলেন। তারপর বললেন, মাসোহারার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তোমার কেস তো বেশ স্ট্রং। তবে মামলা লড়তে হবে। লীলাময়ী শক্ত লোক।
বাঘু আইন টাইন জানে না। তার জানার দরকার নেই। উদাস গলায় বললো, ঝগড়াঝাঁটি করতে তো আসা নয়। একটু বুঝতে এসেছিলুম।
কী বুঝতে এসেছিলে?
আজ্ঞে তাও ঠিক জানি না। ইয়ারদোস্তরা বললো, একবার যাও। আমিও এলুম।
তোমার মতো উজবুক জন্মে দেখিনি। থাকগে ব্যাপারটা আমাকেই বুঝতে দাও।

২

একমাত্র ময়নাই জানে যে, বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সে এখনও শরীরে আর মনে কুমারীই আছে। ছ-মাস শ্বশুরঘরে ছিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হয়নি। কুল্যে তিন চারদিন বাঘু মান্না রাতে ঘরে ছিলো, অবশ্য বেঘোর অবস্থায়। এক বিছানায় যুবতী বউ, তবু তাকিয়েও দেখেনি, তখন দুঃখে চোখে জল আসতো ময়নার, এখন ভাবে, উঃ বাবা, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।

কুমারী থাকার কথাটা অনেককে বলে দেখেছে ময়না, কেউ ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। বিয়ে যখন হয়েছিলো তখন কিছু একটু হয়েই থাকবে। তাই আজকাল আর কাউকে আগ বাড়িয়ে বলে না ময়না। তবে নিজের মনে সে এই কুমারী থাকার ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে, বাঘু মান্না মানুষই ছিলো না। দিনরাত যখনই তাকে দেখা যেতো, তখনই মাতাল। হাটে মাঠে, রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকা ছাড়া বাঘুকে অন্য অবস্থায় বড়ো একটা দেখা যেতো না। বাঁচতে হলে একটা মানুষের খাবার দাবারও চাই। তা-ই বা কি ভাবে জুটতো, কে খাওয়াতো কে জানে। ছ মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলো ময়না, তারপর সব জানিয়ে মাসীকে চিঠি লিখলো। মাসীই একমাত্র ভরসা। গোসাঁইপুরে মাসী অনাথ আশ্রম করেছে, মেয়েদের হাতের কাজ আর লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করছে, দরকারমতো অত্যাচারিতা মেয়েদের বিয়ে ভাঙার বন্দোবস্ত করছে। লীলামাসী লিখলো, বিবাহিতা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি থেকে জোর করে তুলে আনা যায় না। আইনে আটকায়। তুলুকে পাঠাচ্ছি। তার সঙ্গে চুপচাপ চলে আসিস বাপের বাড়ি। তারপর সময়মতো আমি তোকে নিয়ে আসব।

তুলু হলো ময়নার খুড়তুতো ভাই। ম্যাটিনি শো সিনেমা দেখতে যাওয়ার

কথা বলে পালিয়ে চলে এল ময়না। তারপর নিরাপদে মাসীর বাড়িতে। নিজের কুমারী জীবনটাকে এইখানে এসেই সত্যিকারের উপভোগ করতে লাগলো ময়না। মেয়েরা যে আলাদা মানুষ, স্বামীর ঘর আর ছেলেপুলে মানুষ করতেই যে তাদের জন্ম নয়, এটা টের পেতে লাগলো। মাসীর নিজের ঘর সংসার নেই বটে, কিন্তু ছুনিয়াটাই মাসীর সংসার। অনাথা আশ্রম আছে, বাচ্চাদের ইস্কুল আছে, মহিলা সমিতি আছে, একেবারে জমজমাট অবস্থা। শ্বাস ফেলার সময় নেই। ময়না যখন এসে মাসীর পাশে দাঁড়ালো তখন মাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবনটা শুরু কর। মেয়েরাই একদিন ছুনিয়াটাকে চালাবে, দেখিস।

তবে সব জিনিসেরই ভালো মন্দ ছুটো দিক আছে। অনাথাশ্রমের অনেক মেয়েই আসল অনাথা নয়, বিনিমাগনা খাওয়া পরার লোভে এসে সত্যি-মিথ্যে বানিয়ে ব'লে ঢুকে পড়ে। তাদের মধ্যে অনেকে চুরি করে পালিয়েছে। কাজকর্ম কেউ তেমন করতে চায় না। অনেকে নগদ পয়সা চায়। ঝগড়াঝাঁটিও লেগেই আছে। বাচ্চাদের স্কুলে প্রায়ই বেতন বাকি পড়ে। সেলাইস্কুলটা চলে নেহাত দায়সারা গোছের। ময়না এসে অনেক ভূত ঝেড়েছে। কেউ অনাথা বলে এসে হাজির হলেই ঢুকতে দেয় না। খোঁজ নেয়। আশ্রমের জন্য মাতব্বর লোকদের কাছে চাঁদা আদায় করে। বাচ্চাদের স্কুলে বেতন বাকি পড়লে নাম কেটে দেয়। সেলাইস্কুলের সঙ্গে সে আরও কয়েকটা জিনিস যোগ করেছে। রান্না, গান, টোটকা, এখন সব মিলিয়ে একরকম ভালোই চলে। মাসীর হিসেব নিকেশের বালাই ছিলো না। ময়না এসে খাতাটাতা করছে। এখন তাকে ছাড়া মাসী অচল।

সারাদিন এই বিছানো সংসারের হাজারো কাজে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে গিয়েই ময়না টের পায়, সে কুমারী। কোনোও পুরুষের স্পর্শ তাকে কলঙ্কিত করেনি। সে বড়ো বেঁচে গেছে। ভারী একটা সুখ আর গর্ব হয় তার। বাঘু মান্নার সঙ্গে তার সহবাস হলে আজও গা একটু ঘিনঘিন

করতো তার।

কুমারীই থাকতে চেয়েছিলো ময়না। এইসব ভারী উত্তেজক আর মজার কাজে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতো সে। মাসীরও তাতে সায় ছিলো। কিন্তু মুস্কিল বাধালো প্রদীপ।

লীলাময়ীর সংগঠনটা মেয়েদের নিয়ে হলেও কিছু পুরুষ বরাবরই যেমন বাগড়া দিয়েছে, তেমনই কিছু পুরুষ আবার সাহায্যও করেছে। যারা সাহায্য করেছে তারা বেশির ভাগই অল্পবয়সী ছেলে। তাদের ঝোঁকটা অনাথাশ্রমের যুবতীদের দিকেই একটু বেশি বটে, কিন্তু লীলাময়ীর নির্দেশে তারা বহু ভাঙা বিয়ে জুড়ে দিতে সাহায্য করেছে, অত্যাচারী শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হামলা করে শাসিয়ে বউদের নিরাপদ করেছে। লীলাময়ী ডাকলেই তারা হাজির।

প্রদীপ ছিল এদেরই পাণ্ডা। তার মা নেই, লীলাময়ী তাঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছেন প্রদীপকে। এখন গাল ভরে মা ডাকে। ডাকার মতো একটা বাবা আছে বটে প্রদীপের, তবে বাপটা সুবিধের নয়। টাকার কুমীর। দালালি করে দোহাত্তা রোজগার। মদ-মেয়েমানুষের দোষও আছে। প্রদীপ একমাত্র সন্তান হলেও বাপ-ছেলের বনিবনা নেই। ছেলে যে লীলাময়ীকে মা ডাকে সেটাও তার গাত্রদাহের একমাত্র কারণ। তার ওপর ছেলে-ডাকাবুকো, তেজী, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, পার্টি করে।

হারাধন পাণ্ডার ছেলে হিসেবে প্রদীপ পাণ্ডা সুখের জীবনই কাটাতে পারতো। কিন্তু তার ধারটা অন্য বলে তা হলো না। সে অন্যরকম হলো। সে মানুষের জন্য কাজ করতে ভালবাসে, পরোপকার করে বেড়ায়, বাপের মহাজনীর টাকা দুহাতে বিলিয়ে দিতে ভালবাসে।

মাসীর কাছে আসার পর থেকেই ময়না প্রদীপকে লক্ষ্য করেছে। ছিপ-ছিপে পাতলা চেহারা, পরনে সবসময়ে ডোরাকাটা শার্ট আর জীনসের প্যাণ্ট, দিনরাতের বাহন একখানা দামী সাইকেল।

লক্ষ্য করলেও তাকে নিয়ে কিছু ভাবেনি ময়না। তখনোও মনে হতো

পরপুরুষের কথা ভাবাও পাপ। তারপর বাঘু মান্নার সঙ্গে বিয়ে-বিয়ে খেলার পাট চুকলো, প্রদীপের সঙ্গে ভাব হলো। কথা হলো, কথা নানা মোড় ফিরলো। চোখে চোখে হলো।

তারপর প্রদীপ একদিন বললো, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে মাসীকে বলি যে তোমাকে আমি বিয়ে করবো?

ময়না হুট করে জবাব দিলো না। দিতে নেই। ভাবতে সময় চাইলো। মাসীকে লুকিয়ে সে কিছুই করে না। সব শুনে লীলাময়ী বললেন, প্রস্তাবটা তো খুবই ভালো, তোকে বিয়ে করলে প্রদীপের ওপর আমার আরোও জোর হয়। কিন্তু বাপটা খুব ঝঞ্ঝাট করবে। হারাধন পাণ্ডার ক্ষমতা অনেক। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করতে ভয় পাই মা।

ময়না সুতরাং নিজেকে গুটিয়ে রাখলো।

প্রদীপ কাঁচা ছেলে। ময়নাকে দেখে সে মুগ্ধ, বেহেড। তাকে কিছু বোঝানো গেল না। সে ময়নাকে বললো, বাবার ভয়ে পিছিয়ে যাবে? তাহলে আর কিসের আন্দোলন তোমাদের?

ময়না সসঙ্কোচে বললো, ভয় আমার নিজেকে নিয়েও। অতীতের সব কথা কি মুছে ফেলা যায়?

না মুছলে এগোবে কি করে? তুমি কি সেই হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসতে?

ময়না ঠোঁট উল্টে বললো, ভালবাসা! তার মুখটাও ভালো করে দেখিনি কখনো। আমি আজও কুমারী। সম্পূর্ণ কুমারী।

প্রদীপ একমাত্র লোক যে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করলো এবং আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। তার মুখে আনন্দের দীপ্তিটা দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল ময়নার। পুরুষেরা তাহলে যতই আধুনিক হোক, এখনোও কুমারী মেয়েকেই বউ করতে চায়! বড্ড স্বার্থপর জাত।

প্রদীপ বললো, তোমার মুখ থেকে এটা শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে। তাহলে আপত্তি কোরো না। বাবা যা-ই করুক আমি সামলাবো।

কি করে সামলাবে ?
জানি না, ঠিক করিনি। বিয়ে তো আগে করি তারপর ভেবে দেখবো।
ময়না বুদ্ধিমতী, মাথা নেড়ে বললো, আমি ঘরপোড়া গরু। এক অশান্তিতে বিয়ে ভেঙেছি, ফের বিয়ে করে ঘাড়ে অশান্তি নিতে চাই না। তুমি আগে তোমার বাবার মত নাও।
বাবা আর ক' দিন ?
তুমি কি বাবার মৃত্যু চাও ?
তাই চাইলাম নাকি ? বলছি বুড়ো তো হচ্ছে। রক্তের জোর কমছে।
ময়না মৃদু একটু হাসলো ওর ছেলেমানুষি দেখে। তারপর বললো, মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষে একটু তফাত আছে, সেটা বোঝো না? পুরুষেরা বড্ড আবেগে চলে, মেয়েদের একটু হিসেব কষতে হয়।
তার মানে আমি তোমার প্রেমে পড়লেও তুমি পড়োনি। তুমি কেবল হিসেব কষছো।
তোমাকে আমার একটুও অপছন্দ নয়। নইলে কি মাসীকে বলতাম। তুমি বরং আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।
বেশি ভাবলে যদি তোমার অমত হয় ?
প্রদীপের উৎকণ্ঠ উদগ্রীব বায়নাদার শিশুর মতো মুখ ভাব দেখে করুণা হলো ময়নার। সে বললো, অমতে কথা ওঠে না, সব দিক বজায় রাখতে হলে একটু ভাবতে হয়।
গাঁ গঞ্জে ছেলেতে মেয়েতে একটু আধটু গুজগুজ ফুসফুস হলেই তা পাঁচকান হয়ে ঢি ঢি পড়ে যায়। ময়না আর প্রদীপকে নিয়েও কথা রটতে দেরি হলো না।
হারাধন পাণ্ডা তেড়ে এলো একদিন। লীলাময়ীকে বললো, বৃন্দাবন খুলেছো, অ্যাঁ! বৃন্দাবন ? মেয়েছেলের ব্যবসা ফেঁদে কাঁচা ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছো !
কিন্তু মুস্কিল হলো, লীলাময়ী কোনোও জবাব দিতে পারলেন না। হারাধন

পাণ্ডার তড়পানীতে ভড়কে যাবেন তেমন মেয়ে লীলময়ী নন। কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না অন্য এবং গুরুতর কারণে। হারাধন পাণ্ডার বয়স হয়েছে, শরীরের মধ্যে জরা আর ক্ষয় ঢুকেছে। এতো উত্তেজনা আর রাগ তার নিজেরই সহ্য হলো না। আস্ফালন করতে করতে নিজেই বুকে হাত চেপে হঠাৎ চোখ উল্টে দড়াম করে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো। তারপর ডাক্তার-বদ্যি হাসপাতাল। মাসখানেক বাদে যখন হারাধন ফের বাড়ি ফিরে এলো তখন আর সেই হারাধন নেই। জবুথবু, দুর্বল, লাঠিতে ভর। তেজ নেই, চোখের দৃষ্টি ঘোলা। সম্বল শুধু গোঁ।

বাপের হয়ে প্রদীপ ক্ষমা চাইতে এসেছিলো লীলাময়ীর কাছে। লীলাময়ী বললেন, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি বাবা, ওসব আমি গায়ে মাখি না। তবে তোমার বাবার যা অবস্থা দেখলুম তাতে ভয় হয়েছিলো পাছে খুনের দায়ে পড়ি। আমি বলি কি, এখন ময়নার কাছ থেকে একটু তফাত থাকো, তোমার বাবা একটু সামলে উঠুন, তারপর দেখা যাবে।

তফাত হওয়াটা প্রদীপের কাছে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। একবেলা ময়নার মুখখানা না দেখলে তার সর্বাঙ্গ হায়-হায় করতে থাকে। পাল্লার একদিকে ময়না আর অন্যধারে দুনিয়ার তাবৎ সুন্দরী, বাপ মা, টাকা-পয়সা, হীরে জহরৎ, নীতি-ধর্ম বসালেও ময়নার দিকে পাল্লা বেশি ভারী। তফাত হবে কি করে প্রদীপ?

বাপ হাসপাতালে শোওয়া অবস্থাতেই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে লাগলো রোজ। আত্মীয়-স্বজনরা এসে নানাবিধ গঞ্জনায় অতিষ্ঠ করে তুললো প্রদীপকে। সে তিষ্ঠোতে পারছিলো না। শুধু ময়নার জন্যই যা কিছু সয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে বর্ধমান থেকে কাকামশাই এসে উদ্ধার করলেন প্রদীপকে। বললেন, আমার কারবার দেখার লোক নেই। তুই গেলে আমার উপকার হয়।

প্রদীপ বর্ধমানে চলে গেল আনন্দের সঙ্গেই গেল। গিয়ে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে লাগলো ময়নাকে। শনি-রবিবার এসে হাজিরও হতো

মাঝে মাঝে।

যদি কেউ ময়নাকে জিজ্ঞেস করে, প্রদীপ তো তোমাকে ওরকম উন্মাদের মতো ভালবাসে ; কিন্তু তুমি কি ওকে ভালবাসো ? তাহলে ময়না চট করে জবাব দিতে পারবে না। আসলে ভালবাসা জিনিসটা কী তা-ই সে বুঝে উঠতে পারেনি আজও। তার বুকের মধ্যে কোনোও উথাল-পাথাল নেই, উত্তেজনা নেই, শিহরণ নেই। প্রদীপকে তার ভালো লাগে, কথা বলতে খারাপ লাগে না, বিয়ে করতেও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রদীপকে না হলেই জীবন অন্ধকার এমনটাও তো কৈ তার মনে হয় না!

এই সব ভাবে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ময়না।

অনাথাশ্রমের একটা মেয়ে সুবালা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে আছে। তাকে নিয়ে কদিন খুব হৈ-চৈ গণ্ডগোল। একটা রিক্সাওয়ালার সঙ্গে পিরিত করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করে বসে আছে। এইসব ঘটনা যে-কোনোও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ক্ষতিকর। রিক্সাওয়ালা নবীন বিয়ে করতে রাজি নয়। দেশের বাড়িতে তার বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। লীলাময়ী যখন এসব নিয়ে বিপর্যস্ত তখনই হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা উটকো একটা ভিখিরির দশা লোক এসে বললো, আমি বাঘু মান্না।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

লোকটাকে এক পলক দেখেই পালালো বটে ময়না, কিন্তু মনটা ভারী তেতো হয়ে গেল। কপালটাই তার খারাপ। এসময়ে এই লোকটির এসে জুটবার কোনোও মানেই হয় না।

মাসী এমনিতে নিষ্ঠুর প্রকৃতির নন। কিন্তু সুবালাকে নিয়ে মেজাজ বিগড়ে ছিলো বলে পুরুষ জাতটার ওপরেই ক্ষেপে আছেন কয়েকদিন। তাই বাঘু মান্নাকে শীতের রাতে বারান্দায় ফেলে রাখলেন। পরদিন ঘোর জ্বর-বিকার দেখে চালান করে দিলেন হাসপাতালে!

আপদ গেছে।

ক'দিন বাদেই আপদটার নতুন খবর আনলো লীলাময়ীর ঝি কস্তুরি, বাজারটা রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে সে উত্তেজিত গলায় বললো, সেদিনকার সেই লোকটা গো—সেই যে ময়নাদিদির আগের বর—বাঘু না কি যেন নাম—তাকে হাসপাতালের ধাঙড়রা পিটিয়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে।

মাসী রাঁধছে, ময়না যোগান দিচ্ছে, তুজনেই একটু বিরক্তির সঙ্গে ঘটনাটা নিল। মাসী বললে, কী হয়েছিল ?

যা শুনলুম লোকটা নাকি ধাঙড়দের কাজ করে দিচ্ছিলো। হাসপাতাল ঝাঁটপাট দেওয়া, ধোয়ামোছা। তাইতেই ধাঙড়রা রেগে গিয়ে খুব মেরেছে। তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে দেখ গে যাও।

কেউ গেল না দেখতে। বাঘু মান্নার খবরের জন্য কেউ ব্যস্ত নয়। তবে খবর এলো। গোসাঁইপুর, ছোটো জায়গা। খবর তো চাপা থাকে না। বাঘু মান্না নামে একটা লোক যে একটা বীরত্বের কাজ করেছে সেটা অতিরঞ্জিত হয়েই কানে এলো তাদের।

রাত্রিবেলা যখন অর্ডারি তসরের শাড়িতে কাঁথা ফোঁড়ের কাজ করছিলো ময়না তখন মাসী তাকে আচমকা জিজ্ঞেস করলো, লোকটা কেমন ছিলো বল তো !

কোন্ লোকটা ?

ওই বাঘু মান্না। খুব খারাপ ছিলো নাকি ?

ভালো মন্দ কিছুই জানি না। তার সঙ্গে ভালো করে কথাই হয়নি কখনো।

মাতাল ছিলো সে তো জানি। আর কিরকম ছিলো ?

বলতে পরবো না। কিন্তু ওকথা কেন ?

সেদিন শীতের মধ্যে বারান্দায় বার করে দিয়েছিলুম। কাজটা ভালো করিনি। সেদিন মাথাটা বড্ড গরম ছিলো। সুবালা হারামজাদী যে ও-রকম করবে কে জানতো।

সেদিন ঠিক কাজই করেছিলে। বারান্দায় যে ঠাঁই হয়েছিলো তাই ঢের। তুই কিছু মনে করিসনি তো?

দাঁতে সুতো কাটতে গিয়ে থেমে ময়না অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো, আমি কী মনে করবো? মনে করার কথাই বা ওঠে কেন?

লীলাময়ী গম্ভীর হয়ে গিয়ে খুব আস্তে করে বলেন, কোন্ কাজটা যে ঠিক হচ্ছে আর কোন্‌টা যে ভুল হচ্ছে সেটা আজকাল যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বয়সের দোষই হবে।

ওসব নিয়ে ভেবো না। বাঘু মান্না বদ্ধ মাতাল। বাইরে পড়ে থাকার অভ্যাস তার খুব আছে। পেটে মদ থাকলে ঠাণ্ডাটা লাগতো না। সেদিন পেটে মদ ছিলো না বলে লেগেছে।

লীলাময়ী আয় ব্যয়ের একটা হিসেব করছিলেন, সেটা ঠেলে সরিয়ে রেখে ভারী উদাস গলায় বললেন, আজকাল সব ছাইমাটি বলে মনে হয়।

ছাইমাটি আবার কী! কিসের কথা বলছো!

লীলাময়ী উদাস গলায় বললেন, এই যে এতো কিছু করলুম, ছোটো হলেও একটা অনাথাশ্রম তো বটে, সেলাইয়ের স্কুল, তাঁতশিক্ষা, গানের স্কুল, বাচ্চাদের স্কুল—একজনের পক্ষে কম নয় কাণ্ডখানা। কিন্তু এতো কিছু করে কী হলো বলো।

অনেক তো হয়েছে মাসী। কত মেয়ে তো বেঁচে গেছে।

সে তো ঠিক। কিন্তু আবার দেখ সুবালার মতো গেরোও তো আছে। অনাথাশ্রমে এই নিয়ে চারজন এরকম কাণ্ড করলো। এদের জন্যই এক এক সময়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

তোমাকে আজ কী যেন কামড়াচ্ছে মাসী।

কামড়াবে না! আমার জীবনটা যদি তোর হতো তো বুঝতিস। দুনিয়া-ভরা সব অকৃতজ্ঞ। লীলাময়ীর দোষ দেখলেই সব ফোঁস করে ওঠে। কিন্তু লীলাময়ীর যে ভালোটুকু করে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

ময়না মাসীকে চেনে। মাঝে মাঝে দোর্দণ্ডপ্রতাপ লীলাময়ীর এরকম ভাব আসে। তখন তোয়াজি কথা বলতে হয়। ময়না সেলাইটায় একটু ঢিলে দিয়ে বললো, তোমার দোষ যারা দেখে তারা তো অন্ধ। ওদের কথা ছাড়ো। সমাজের ভালো যারা করে তাদের ওপর সকলের হিংসে। নিজেরা পারে না তো। কিন্তু তোমার গুণের কথাও কি বলে না লোকে। সবাই বলে।

লীলাময়ী কথাগুলো শুনলেন। আবার শুনলেনও না। বয়স খুব বেশি হয়নি লীলাময়ীর। চল্লিশের মধ্যেই। তবু হঠাৎ বেশ বুড়ো দেখালো তাঁকে।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে লীলাময়ী জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, বাঘু মান্না কি লেখাপড়া জানতো ?

কেন বলো তো !

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

ম্যাট্রিক পাশ বলে শুনেছি।

ও বাবা। তাহলে তো অনেক পড়েছে।

আজকাল ন্যাড়াছ্যাড়া কতো লোক ম্যাট্রিক পাশ করে। বাঘু যে আজ কেন তোমাকে কামড়াচ্ছে কে জানে। তবে যাই বলো, লেখাপড়া তার কোনোও কাজে লাগেনি। মদের ঘোরে সেসব ভুলেও মেরে দিয়েছে। ও-সব নিয়ে ভাবছো কেন ?

লীলাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে সব কিছু নিয়েই ভাবতে হয়। সব ভাবনা যখন একসঙ্গে এসে মাথায় ভর করে তখন যে কী যন্ত্রণা। ওই সুবালা মুখপুড়িকে নিয়েও কি কম জ্বালা আমার! নবীন যদি তাকে শেষ অবধি বিয়ে না-ই করে তবে কি হবে বলো তো! পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে বলবো ? সেটা তো পাপ হবে। আবার যদি বাচ্চাটা হয়ও তখন তার বাপের পরিচয় কী হবে ?

ময়না ভ্রূ কুঁচকে বললো, কী আবার হবে! বাচ্চাটা আনাথাশ্রমেই মানুষ

হবে। এরকম আকছার হচ্ছে। অনাথাশ্রম তো রয়েছেই সেইজন্য।
সে তো ঠিকই রে। কিন্তু সেটা হলো মন্দের ভালো। আমি চাই ভালো করতে। মন্দের ভালো দিয়ে কতোদিন চলবে?
তোমার সব বিদঘুটে কথা, বিদঘুটে ভাবনা। অতো ভেবো না তো।
আমার কি ভাবনার শেষ আছে? তুই কি জানিস যে আমার সতীন পোয়েরা আজকাল আমাকে চিঠি লেখে!
কৈ বলোনি তো কখনো! কী লেখে তারা?
আজকাল প্রায়ই তাদের চিঠি পাই। কী আর লিখবে, অভাবে পড়েছে, তাই সাহায্য চায়।
তাই বলো। আমি ভাবলুম বুঝি তোমার খবর নেয়।
সেও নেয়। চিঠিতে গালভরা মা ডাক, তার আগে আবার শ্রীচরণেষু পাঠ লেখা থাকে। ধানাই পানাই মেলা কথা। আসল কথাটি থাকে শেষে। অভাব, দিন চলে না।
তাদের লজ্জা করে না লিখতে!
লজ্জা করলে তাদের চলবে কেন? আমার তো মনে হয় ওদের বাপই ও-সব লেখায়। কে জানে বাবা সে নিজেই ছেলেদের নাম দিয়ে লেখে কি না।
এ কথায় ময়না একটু খুক করে হাসলো। তারপর বললো, মেসো কি বেঁচে আছে এখনোও?
মেসো বলে ফেলেই জিব কাটলো ময়না। মাসী বিয়ে-ভাঙা তেজী মেয়ে, মেসো কথাটা শুনে রেগে যাবে হয়তো।
লীলাময়ী রাগ্‌লেন না। হয়তো খেয়ালই করেননি। উদাস গলায় বললেন, বেঁচে থাকবে না কেন! তার তো বয়স বেশি নয়। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে।
লোকটা কেমন ছিলো মাসী?
লীলাময়ী ময়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, তুই যেমন বাবু মান্নাকে চিনিস আমিও গুণেন সামন্তকে ততটুকুই চিনি।

কেমন লোক তা কী করে জানবো ? তবে জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, বেহায়া তো বটেই। ঘর করলে হয়তো আরও গুণের কথা বেরোতো। তবে একটা জিনিস দেখেছি, ভারী হাসিখুশি আর আহ্লাদী মুখ। যখন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে মারতে গেছি তখনও হাসি-হাসি মুখ করে দাওয়ায় বসে ছিলো, পালায়নি বা উল্টে তেড়েও আসেনি।

মারলে ?

না। হাতটা তুলেও ঠিক পারলুম না। ওই হাসি-হাসি মুখের জন্যই।

লোকটা কী করলো তখন ?

পায়ে ধরতে এসেছিলো। দু ঘরের দরজায় আগের পক্ষের দুই বউ দাঁড়িয়ে ফুঁসছে আর তিন নম্বর বউয়ের পা ধরতে ধুমসো লোকটা এক পাল ছেলেপুলের সামনে দিনে দুপুরে উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে—ভাবতে পারিস ?

ময়না হি হি করে হেসে বললো, ভীষণ হাসি পাচ্ছে মাসী।

হাসি তো এখন আমারও পায়। তখন তো হাসি পায়নি, লোকটাকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিলো।

সে-ই যে চিঠি লেখে কি করে বুঝলে ?

সে-ই লেখে বা ছেলেদের দিয়ে লেখায়। ও মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যাদের মেরুদণ্ড থাকে না তারা সব পারে।

তা এখন কী করবে ? সাহায্য পাঠাবে নাকি ?

ভেবে দেখিনি। চিঠিগুলো আসে, পড়ি, রেখে দিই। কিছু ভাবিনি।

তুমি আজকাল বড্ড নরম হয়ে গেছ মাসী।

ওই তো বয়সের দোষ। কম বয়সে রোখ বেশি থাকে, বয়স বাড়লে নানা বিবেচনা আসে। বাঘুকে সেদিন ঠাণ্ডায় বারান্দায় বের করে দিয়েছিলাম বলে মনটা কেন যেন খারাপ লাগছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে তো আসেনি, আতান্তরে পড়ে এসেছিলো।

সে তো ঝড়ে বাদলায় রাস্তার কুকুরটাও এসে ঘরে ঢুকতে চায়। তার

আর কী করা যাবে? মেরুদণ্ড থাকলে সেই লোক কি এসে এখানে হাজির হয়! বেহায়া তো বাঘু কিছু কম নয়।

লীলাময়ী উদাস গলায় বললেন, তোদের বিয়ে যে ছাড়ান কাটান হয়েছে তা তো বাঘু জানত না।

জানত না মানে? নোটিস তো গিয়েছিলো।

সেই নোটিস কার হাতে গেছে কে জানে! বাঘুর ভাইটাইরা হয়তো বুঝতেই পারেনি ইংরিজি নোটিস। দেয়ওনি ওর হাতে।

সে তো আর আমাদের দোষ নয়!

দোষ কে বলেছে। তবে বাঘু যে জানত না সেটা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। জানলে হয়তো আসত না।

তুমি বড্ড বাঘু-বাঘু করছো মাসী। বাঘু যে কোন্ মন্ত্রে তোমাকে বশ করলে।

লীলাময়ী হাসলেন। বললেন, বশ নয় রে। দুঃখী মানুষ দেখলে আমার যে কষ্টটা হয় তা বাঘুকে দেখেও হয়েছিলো। তার বেশি কিছু নয়, তুই কথাটা ঘুরিয়ে ধরিসনি যেন। রাস্তার কুকুর বললি তো! বাঘু তা-ই। তবে কুকুরটার জন্যও তো মানুষের মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।

ময়না ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিলো। ভাবলো মাসীর মনটা ভালো নেই আজ। থাক। সতীন পোয়ের চিঠি মাসীর এই ভাবান্তরে ইন্ধন দিচ্ছে না তো! হতেও পারে। নাঃ, মাসীর জায়গাটা একদিন তাকেই নিতে হবে। মাসী বড়ো নরম হয়ে পড়ছে।

পরদিন সকালে কস্তুরী যখন বাজারের টাকা নিচ্ছিলো তখন লীলাময়ী তাকে বললেন, ওরে বাঘু মান্নার খবরটা একটু নিয়ে আসিস তো। মার খেয়ে কী হলো ছোঁড়ার!

বেঁচে আছে। আবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তো।

সে তো জানি। লোকের মুখে শুনেওছি। চিরকাল তো আর হাসপাতালে থাকবে না, একদিন ছুটি তো হবে। একটু খবর নিস তো বাবা।

খবর পাওয়া গেল আরও দিন সাতেক বাদে। কস্তুরী বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বললো, ওগো তোমাদের সেই বাঘু মান্না যতীন উকিলের ঠাঁইয়ে গিয়ে জুটেছে কাল থেকে।

যতীন উকিল! বলে লীলাময়ী একটু ভাবনায় পড়লেন।

ময়না স্নান করে এসে উঠোনে কাপড় মেলতে মেলতে কথাটা শুনতে পেলো। তার কোনোও ভাবান্তর হলো না।

লীলাময়ী আপনমনে বললেন, যতীন তো হারাধনের লোক।

কস্তুরী ঝেঁঝে উঠে বললো, কে জানে বাবা কে কার লোক। তবে যতীন খারাপ যন্তর জেনে রেখো। যে উকিলের পসার নেই, সে বড়ো পাজি হয়। কেবল কলকাঠি নেড়ে বেড়ায়।

ময়না যতই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিক, বাঘু মান্নার গোঁসাইপুরে এসে উদয় হওয়াটা যে ভালো লক্ষণ নয় এটা লীলাময়ী টের পাচ্ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। ময়নার বিয়ে হয়েছিলো, বিয়ে ভেঙেও গেছে, এটা সবাই জানে। বিয়ে কার সঙ্গে হয়েছিলো, কী বৃত্তান্ত তা লোকে জানে না। আর এই না-জানাটাই ছিলো একরকম ভালো। কিন্তু বাঘু উদয় হওয়ায় অজানা ভাবটা রইলো না। এখন লোকে বাঘুকে দেখবে, বিচার করবে, নানাকথা ফাঁস হতে থাকবে। নতুন করে একটা পুরোনো ব্যাপারকে খুঁচিয়ে ঘুলিয়ে তুলবে লোকে। লীলাময়ীর শত্রুর অভাব নেই। তাদের মধ্যে একজন হলো ওই যতীন উকিল।

তুমি কেন যে এ নিয়ে এতো ভাবছো মাসী। বাঘু কী করবে? তার কোনোও ক্ষমতাই নেই। কোর্ট কাছারি করার ক্ষমতাও তার হবে না। আর করবেই বা কেন? তবে তোমার সতীন পোয়েদের মতো সেও কিছু সাহায্য চাইতে পারে।

চাইলে কী করবি?

তাড়িয়ে দেবো।

লীলাময়ী মাথা নেড়ে বললেন, তোর বেজায় বুকের পাটা। বয়স কম

তো ! আমার আজকাল সব ব্যাপারেই কেমন ভয়-ভয় করে।

ভয় পেও না। আমি তো আছি। আমি সব সামাল দেবো।

লীলাময়ী চুপ করে রইলেন।

দিন কয়েক বাদে শেওয়ালের মতো মুখ করে ভর-সন্ধেবেলা যতীন উকিল এসে হাজির। প্রথম মন-ভেজানো নানারকম বিনয়-বচন। মুখে হাসি-খানা ঝোলানো।

ময়না আর লীলাময়ী নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে টেলিপ্যাথি করে নিলেন। হিসেব করে কথা কইতে হবে এবার। যতীনের মতলব আছে।

ধানাই পানাই শেষ করার পর গলাটলা পরিষ্কার করে নিয়ে মোলায়েম গলায় যতীন বললো, লীলাদিদি, বড়ো মুস্কিলে পড়েছি। বাঘেন্দ্র মান্না বলে কি কাউকে চেনেন ? নামটাও খুব অদ্ভুত, এমন বিটকেল নাম জন্মে শুনিনি বাবা। তা নাম যেমন বিটকেল, লোকটাও তেমনি বিটকেল। নানা আগড়ম বাগড়ম বকছে। ময়নার সঙ্গে নাকি তার একটা কিরকম সম্পর্ক ছিলো। আমার তো বিশ্বাস হয় নি। তাই আসা।

লীলাময়ী জবাব দেওয়ার আগেই ময়না হিমশীতল গলায় বললো ঠিকই বলেছে। বাঘুর সঙ্গে আমার একটা বিয়ে হয়েছিলো। আর কী জানতে চান ?

যতীন ভারী যেন চমকে উঠলো কথাটা শুনে। শশব্যস্তে বলে উঠলো, তাই নকি ! তাই নাকি ! ছাখো কাণ্ড !

ময়না বললো, বিয়েটা ভেঙে গেছে। আদালতের রায় আমাদের কাছে আছে দেখতে চান ?

যতীন উকিল সবেগে মাথা নেড়ে বলে, কোনোও দরকার নেই। ও বিয়ে ভেঙে ভালো কাজই করেছো। বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

ময়না এ কথায় একটু ভিজলো। নরম হয়ে বললো, বাঘুও বোধহয় সেটা জানে।

জানে বৈকি। তার বিয়ে যে ভেঙে গেছে এটা সে জানতো না। আহাম্মক

আর কাকে বলে। ট্যাকে পয়সাও নেই যে একটা বেলা পেটটা চালিয়ে নেবে। বাড়ি ফেরার রাহাখরচা পর্যন্ত যোগাড় হচ্ছে না।

ময়না মৃদুস্বরে বললো, ওকে মাসীর কাছে আসতে বলবেন। মাসী ওর ভাড়াটা দিয়ে দেবে।

তা তো বটেই। লীলদিদি কতো লোকের সাহায্য করে। রাহাখরচটা এমন কিছু বেশিও নয়। আমিও দিয়ে দিতে পারতুম। তবে ভাবলুম, ন্যায্যত ওটা তোমাদেরই দেওয়ার কথা।

ময়না আর কিছু বললো না, ভাবলো কথা বুঝি শেষ হয়ে গেছে, এবার যতীন উঠবে।

কিন্তু যতীন উঠলো না। বসে বসে যেন খানিকক্ষণ গভীরভাবে কী চিন্তা করে ময়নার দিকে চেয়ে বললো, আচ্ছা ময়না, তোমার রোজগার এখন তো বেশ ভালোই।

ময়না অবাক হয়ে বললো, ভালো মানে?

কেমন হয় টয়?

কী আবার হবে। বাচ্চাদের পড়াই, সেলাই করি, গান শেখাই। চলে যায় কোনোও রকমে।

শ'চার পাঁচ হবে কি? না কি একটু বেশিই?

হিসেব করিনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন?

কথাটা কি জানো, বাঘু হলো বেকার, কপর্দকহীন বলতে গেলে। খুব বিপদের মধ্যেই আছে। ভাবছিলাম, তোমার রোজগার থেকে মাসে মাসে তাকে কিছু দেওয়া গেলে কেমন হয়।

ময়না স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো, আমার রোজগার থেকে বাঘুকে দেবো? কেন আমার পয়সা কি সস্তা?

ময়নার গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ ছিলো, কিন্তু যতীন উকিল একটুও চটলো না। মৃদু একটু হেসে বললো, উদয়াস্ত রক্ত জল করা পয়সা কি কারোও সস্তা হয়? সে কথা বলছি না। বলছিলুম, এ বেচারার দিকটা কে দেখে বলো।

এর চলবে কি করে ?

তার আমি কী জানি! বাঘুর সঙ্গে আমার তো সম্পর্ক নেই। যাদের আছে তারা দেখুক।

সম্পর্ক তার এখনো কারোও সঙ্গেই নেই। বাপ মরেছে, ভাইরা বিষয়-সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এ বেচারা পড়েছে বিপদে। তুমি যদি ওরটা একটু চালিয়ে নিতে পারো তবে ছেলেটা বেঁচে যায়।

ময়না এবার সত্যিকারের রাগলো। প্রায় চেঁচিয়ে বললো, কোন্ সাহসে আপনি এ কথা বলছেন বলুন তো। একটা মাতাল বদমাশ লোকের জন্য আমি টাকা দেবো কেন ?

যতীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে চলবে কেন ?

ময়না আরোও রাগলো, আরোও চেঁচালো, চলবে কেন মানে? এ কি জবরদস্তি নাকি ?

লীলাময়ী এতক্ষণ কথা বলেন নি। এবার হাত তুলে ময়নাকে নিরস্ত করে যতীনের দিকে চেয়ে বললেন, বাঘু কি খোরপোষ চায় ?

যতীন উকিল এবার হাসলেন। বললেন, এবার একটা কথার মতো কথা বলেছেন বটে লীলাদিদি। বাঘু হলো তো বাইরের লোক। বাইরের লোককে আমরা বাঙাল বলি। তা বাঘু বাঙাল মানুষ যেমনই হোক, পাগল ছাগল মাতাল যাই হয়ে থাকুক না কেন, ময়নার সঙ্গে তার আইনত আর ধর্মতো বিয়ে হয়েছিলো। সম্পর্কটা এখন আর স্বামীস্ত্রীর নেই বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের সম্পর্ক শেষ হয় নি। সুতরাং বাঘু ইচ্ছে করলে কোর্টকাছারি করে খোরপোষ আদায় করতে পারে। আমি অবশ্য সেকথা বলি না। ততদূর করার দরকারও নেই। আপসে হয়ে গেলেই ভালো। শত হলেও সে বাইরের লোক। তাকে নিয়ে ফ্যাকড়া তুলে আমরা সম্পর্ক খারাপ করি কেন ?

ময়না ফের চেঁচালো, কক্ষনো না। কিছুতেই সেই মাতালটাকে আমি এক পয়সাও দিতে দেবো না।

লীলাময়ী ফের হাত তুললেন। তিনি ডিভোর্সের মামলার আইন জানেন। যতীন উকিল কী চাইতে এসেছে তাও তাঁর আঁচ করা ছিলো। তিনি বললেন, খোরপোষ কি বাঘু চেয়েছে ?

খোরপোষ কথাটা বড্ড বিচ্ছিরি। খোরপোষ বলে নয়, গরিবকে কিছু দিলেন এরকম মনে করে দিলেও হবে। বাঘু বাঙাল টাকার পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দেড় দুশো টাকা করে দিলেও হয়ে যাবে। পেট তো মোটে একটা।

ময়না বুঝতে পারলো, এর মধ্যে আইনের একটা প্যাঁচ আছে। তবু সে যথাসাধ্য তেজ প্রকাশ করে বললো, ঠিক আছে, তাকে আদালতেই যেতে বলবেন। আদায় করুক সে খোরপোষ। আমি এমনিতে দেবো না।

যতীন উকিল তবু চটলো না। ভারী মিষ্টি করে বললো, আমি তো বলেই দিয়েছি বাঘু বাঙাল বাইরের লোক। তার হয়ে ওকালতি করতে আমার আসা নয়। বরং তোমাদের পক্ষই আমার নেওয়া উচিত। আর আসাও সেই জন্যই। বলছি কি, যদি আপসে হয়ে যায় তাহলে আর আইন-আদালত করা কি ভালো ?

লীলাময়ী এবার মাঝখানে পড়ে বললেন, ময়না যা বলছে সেটা ধরবেন না। আমি জানতে চাই বাঘু খোরপোষ চায় কি না।

না চাইলে আমার আসবার তো দরকারই ছিলো না লীলাদিদি।

আমি তার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই।

তার মুখ থেকে ! কেন বলুন তো !

যতীন উকিল খুবই যেন বিস্মিত এমনভাবে চেয়ে রইলো লীলাময়ীর দিকে।

লীলাময়ী মৃদুস্বরে বললেন, সে নিজে চাইলে আমরা দেবো।

যতীন উকিল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি এখন যা বলছেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় লীলাদিদি। সে যখন আতান্তরে পড়ে এসেছিল তখন তাকে আপনি আমল দেননি। বারান্দায়

বের করে দিয়েছিলেন। খেতেও দেননি। এখন শুধু তার মুখের কথাটা শুনলেই তাকে খোরপোষ দেবেন এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা। সে তো একবার মুখ ফুটে চেয়েছিল, তখন তাকে পাত্তা দেননি কেন ?

সে সব বলেছে বুঝি ?

তার লুকোবার তো কিছু নেই।

আমার সেদিন মাথার ঠিক ছিল না। কত দিক সামাল দিয়ে আমাকে চলতে হয় সে তো জানেন। পরে মনে হয়েছে, ময়নাকেও বলেছি, কাজটা ঠিক হয়নি।

যতীন উকিল মাথা নেড়ে বলে, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি লীলাদিদি। লোকটা নিউমোনিয়ায় মরতে পারত। তাতে আপনার বদনাম বাড়তো।

আমি তার কাছে ক্ষমা চাইবো।

যতীন খুব হাসলো। বললো, ক্ষমা টমা বুঝবার মতো এলেম তার নেই। সে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে আছে। ভীতুও খুব। হাসপাতালে ধাঙড়দের হাতে মার খেয়ে মরতে বসেছিল। আপনাদেরও সে খুব ভয় পায়। ক্ষমা চাইলে ঘাবড়ে যাবে।

সে এখন কোথায় আছে ? আপনার বাড়িতে ?

আমার বাড়িতেই আছে বটে, তবে না থাকার মতোই। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়, কি করে তা জানি না। তার নাগাল পাওয়া মুস্কিল।

লীলাময়ী বুঝলেন, বাঘুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারটা যতীন ঘটতে দিতে চায় না। তিনি হঠাৎ বললেন, বাঘু কেমন লোক যতীনবাবু ?

যতীন মাথা নেড়ে বললেন, গরিবেরা কি আর একবগ্‌গা মানুষ হয় ? তারা কখনও ভালো কখনও মন্দ। যখন যে পরিস্থিতিতে পড়ে।

এখনও মদ খায় ?

আগে খেত নাকি ? কি জানি, জানি না। তবে মদ খাওয়ার পয়সা তার নেই।

লীলাময়ী মৃদুস্বরে বললেন, তার আরও অনেক কিছুই নেই। তার ঘটে এত বুদ্ধি নেই যে, খোরপোষ আদায় করবে। তাকে আপনি বুদ্ধি দিয়েছেন, তাই না!

যতীন হাসল। বুদ্ধি যার না থাকে তাকে বুদ্ধি জোগানোই তো উকিলের কাজ।

যতীন চলে যাওয়ার পর ময়না আর লীলাময়ী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ময়না বললো, তুমি লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিলে না কেন মাসী? আমার এমন রাগ হচ্ছিলো।

রাগ করে লাভ কী? আইন বাঘুর পক্ষে। তুইও মাথা ঠাণ্ডা কর তো। রাগিস না। যতীন উকিল যে এরকম একটা কিছু করবে তা আমার আন্দাজ ছিলো।

রাগে উত্তেজনায় ময়না রাতে খেতে পারলো না। বিছানায় শুয়ে তপ্ত মাথায় ছটফট করতে লাগলো। তার মেজাজ চটকে গেছে, ঘুম চটকে গেছে। সে এখন হাতের কাছে পেলে বাঘুর গলায় আঁশবঁটি বসিয়ে দেয়।

৩

বাঘু বাঙাল যে পাগল লোক এটা অল্প দিনেই লোক বুঝে গেছে। সারা-দিন ধরে লোকটা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে বসে পড়ে গল্প করে। তার চেয়েও বড়ো কথা, লোকটা বেগার খাটতে বড় ভালবাসে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের রাস্তা পার করে দিলো, কারও মোট বয়ে দিলো, অশ্বিনীবাবুর যে নতুন বাড়ি উঠছে সেখানে গিয়ে কুলি কামিনদের সঙ্গে ইট বয়ে এল খানিক, কারও নার-কোলগাছ থেকে নারকোল পেড়ে দিলো, বাজারে ঝগড়া কাজিয়ার মাঝ-খানে গিয়ে পড়ে দু পক্ষকে থামালো, কারও কুয়োয় নেমে জিনিস উদ্ধার করে দিলো, কিন্তু পয়সাটয়সা নিলো না বা চাইলো না। এ লোক বাঙাল নয় তো কে বাঙাল ?

বাঘুর বাইটা চেপেছে হাসপাতাল থেকেই। হাসপাতালে ঝাঁটা মেরেই সে বুঝতে পেরেছিলো, এ একটা কাজের মতো কাজ। তারপর থেকেই তার কাজের মতো কাজের নেশা। তা হাসপাতালেও মাঝে মাঝে যায় বাঘু। সাফসুতোরা করে দিয়ে আসে। ধাঙড়রা তাকে আর কিছু বলে না। বরং তাদের সঙ্গে বাঘুর এখন রীতিমতো ভাবসাব। তারা তাকে বিড়িটিড়ি দিতে চায়। বাঘু নেয় না।

বাঘু এখন নতুন চোখে দুনিয়াটাকে দেখছে। বহুকাল দেখেনি। নেশার ঘোর-লাগা চোখে সে একরকম আবছা একটা চেহারা দেখতো বটে পৃথিবীটার কিন্তু সেটা যে কেন টিকে আছে তা বুঝতে পারত না। পৃথিবীটা কেন টিকে আছে তা আজও বোঝে না বাঘু। তবে নতুন চোখে বুঝবার চেষ্টা করছে।

যতীনবাবু বড়ো রাগ করে মাঝে মাঝে, ওহে দিব্যি তো খ্যাটনের জোগাড় করতে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছো, তা নামছো কবে ?

আজ্ঞে নামালেই নেমে যাই।

আর ভালমানুষি দেখাতে হবে না। মাজাটা একটু দাবাও বসে বসে। বড্ড রস জমে যায় আজকাল।

যতীনবাবুর মাজা দাবাতে কোনোও অপমান বোধ করে না বাঘু। সে এও জানে যতীনবাবুর মুখের কথাগুলো ধরতে হয় না। লোকটা কেপ্পন বটে, বজ্জাতও হতে পারে, কিন্তু বাঘুর বিশ্বাস, লোকটা তার ভালোই চায়।

একদিন রাত্রিবেলা যতীনবাবু বাইরে থেকে ফিরে এসে আহ্লাদের সঙ্গে বললো, ওহে বাঙাল, তোমার হিল্লে বুঝি হয়ে গেল।

কিসের হিল্লে ?

খোরপোষটা বোধহয় এবার পেয়ে যাবে। লীলাদিদির কাছে গিয়েছিলুম। ময়না একটু তড়পাচ্ছিলো বটে, কিন্তু লীলাদিদি জল। মাসে মাসে যদি দেড় দুশো টাকা আদায় হয় তাহলে তো লটারিই মেরে দিলে হে প্রায়। ঘরে বসে গতর না নেড়ে রোজগার। আর গতর যদি একটু নাড়ো, চাষবাসে কিছু তুলতে পারো, তাহলে তো গন্ধমাদন হয়ে গেল।

বাঘু আগে ভাবতো না, আজকাল ভাবে। ভাবন-রোগটা তার ইদানীং হয়েছে। যে-কোনোও কথাই সে আজকাল নেড়েচেড়ে শুঁকে টিপে দেখে। কথাটা পচা না বাসি, টক না মিষ্টি, ভালো না মন্দ এসব বিচার করতে তার সময় লাগে। এ কথাটাও সে অনেকক্ষণ ভাবলো। দু দিন ধরে নাগাড়ে ভাবলো।

একদিন সে যতীনবাবুকে বললো, আপনি আর ও বাড়িতে যাবেন না।

কোন্ বাড়িতে ?

ওই লীলাময়ী মাসীর বাড়িতে।

কেন বলো তো !

ত্বটো অবলা মেয়ে করেকর্মে খাচ্ছে ওদের পয়সা আমি নিতে পারবো না।

তোমাকে কি আর সাধে বাঙাল বলি? ভালোমানুষির একটা শেষ আছে হে। এটা কলিযুগ মনে রেখো।

আপনি আর যাবেন না।

রোসো বাপু, কথাটা তোমাকে নিয়ে নয়। কথাটা হলো আইনের। আইন যখন বলছে তোমার খোরপোষটা প্রাপ্য তখন ওটা ধর্মত তোমার প্রাপ্য। নিলে পাপ হবে না, অন্যায়ও হবে না।

আমি অত কথা বুঝি না। আমার মাথায় কুলোয় না। তবে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইচ্ছে না হলেও উপায় নেই। এসব কথা বাইরে বলার দরকার নেই। চুপচাপ থাকবে। মাথায় যখন কুলোয় না তখন বেশি বুঝাবার দরকারই বা কী তোমার? যা করার আমি করবো।

বাঘুর এ কথাটাও পছন্দ হলো না। কথাটা বড্ড বেশি দুর্গন্ধযুক্ত। কথাটা তার একদম পছন্দ হচ্ছে না।

মাজার ব্যথাটা বেড়েছে বলে যতীনবাবুকে একটা বাঁধা রিক্সার বন্দোবস্ত করতে হলো। রোজ কাছারিতে নিয়ে যাবে। ফেরত আনবে। যতীনবাবু বাঘুকে বললেন, তুমিও রোজ চলো আমার সঙ্গে। কাছারিতে গেলে মানুষের চোখ ফোটে, জ্ঞান বাড়ে।

তা যায় বাঘু। যতীনবাবু মহকুমা শহরের কাছারিবাড়িতে ঢুকে গেলে নবীন অন্য ট্রিপ মারতে যায়। বাঘু বটতলায় বসে থাকে। নানা লোকের সঙ্গে গল্প করে। কখনোও বা বেরিয়ে শহরটা ঘুরে দেখে আসে। এক আধদিন নবীন তাকে রিক্সায় তুলে খানিক চক্কর মেরে আনে।

একদিন কথায় কথায় নবীন বললো, ময়না নাকি তোমারই বউ?

জিভ কেটে বাঘু বললো, কোন্ জন্মে ছিলো। ওটা কিছু নয়। ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে।

তবে তুমি মাল এখানে ঘুরঘুর করছো কেন ?

যাওয়ার জায়গা নেই যে।

ওরা তুটোই গেছো মাগী। যদি লাগতে এসে থাকো তাহলে কপালে তুঃখ আছে।

লাগতে আসিনি।

আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলো, জানো না তো! সুবালা নামে একটা মেয়ে —কার সঙ্গে না কার সঙ্গে তার পিরিত—আমাকে ধরে বললো, বিয়ে করতে হবে।

বাঘু কথাটার মধ্যে তুর্গন্ধ পাচ্ছিলো। তাই অপলক চেয়ে রইলো।

নবীন বললো, বাচ্চা বাধিয়ে বসেছে তার আমি কী করবো ? আমার বলে বউ-ছেলে আছে।

বাঘু নবীনকে খুব লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ বললো, সুবালাকে তুমি চিনলে কি করে ?

চেনা আর কিসের ? এক জায়গায় থাকলে চেনাজানা হয়ই। কথাবার্তা হতো মাঝেসাঝে। তাই থেকেই ধরে নিলো যে, আমিই হচ্ছি সেই লোক।

সুবালা তোমার নাম বলেছে।

ওই তো হয়েছে মুস্কিল। মেয়েটা গ্যাকার হদ্দ।

এতো লোক থাকতে তোমার নামই বা বলে কেন ?

মেয়েরা বিপদে পড়লে ওরকম বলে। আমাকে বোধহয় বোকাসোকা ঠাউরেছে। ঘাড়ে চালান দিতে সুবিধে।

তোমাকে দেখে বোকা লোক মনে হয় না।

এ কথায় নবীন চটলো। বললো, দেখ বাঙাল, তোমার বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আর অতো জেরাই বা কিসের।

বাঘু খুব কাহিল হাসি হেসে বললো, জেরা করবো কেন, ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি। আজকাল কথা বুঝতে আমার সময় লাগে। তুনিয়াটা আমার

কাছে নতুন তো।

নবীন খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললো, সাধে কি আর তোমাকে বাঙাল বলেছে !

সুবালা মেয়েটা কেমন ?

বললুম না ন্যাকার হদ্দ। বদের হাঁড়ি।

দেখতে শুনতে কেমন ?

ভালো আর কি। ওই একরকম। কেন ওদিকে ঝোঁকার চেষ্টা কেন ? খুব রস হয়েছে ?

বাঘু মাথা নেড়ে বললো, না হে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

বুঝবার কিছু নেই রে ভাই, তুনিয়ায় মেয়েপুরুষ যতো দিন আছে ততো দিন ওসব হবেই। ভগবানেরই লীলা সব।

বাঘু নবীনকে ভালো করে দেখে নিলো। নবীন যে যতীনবাবুর রিক্সা-ওয়ালা হয়েছে তার পিছনে কি কারণ নেই ? যতীন উকিল বুদ্ধি দেওয়ার ওস্তাদ লোক।

নবীনও অনেকক্ষণ বাঘুকে নিরিখ করলো। তারপর হঠাৎ নরম সুরে বললো, বাঙাল. একটা কথা বলবো ?

কি কথা ?

যদি কথার মধ্যে প্যাঁচ না ধরো তবে বলি।

প্যাঁচ ধরতে আমি এখনও শিখিনি। তবে বুঝতে আমার একটু সময় লাগে।

বলছিলুম কি তোমার তো কাঁচা বয়স, একাবোকা মানুষ। কোনোও পিছু-টানও নেই। কী বলো ? সব ঠিক বলছি তো !

তা তো ঠিকই বলছো।

তুমি একবার সুবালাকে দেখো।

দেখে ?

দেখলে তোমার মায়া হবে। কোন্ গু-খেকোর ব্যাটা তার সর্বনাশ করে

গেছে বলে মেয়েটার জীবন কেন নষ্ট হয়। সে খারাপ মেয়ে নয় ; আমি জানি। সঙ্গদোষে পড়ে আর লীলা-ময়নার অত্যাচারে বখে গিয়েছিলো।

তারপর ? থামলে কেন ?

এর পরের কথাটাই কঠিন।

এ পর্যন্ত আমি দিব্যি বুঝতে পারছি।

কি বুঝলে ?

তুমি সুবালাকে একবার বললে ন্যাকার হদ্দ আর বদের হাঁড়ি। পরে ফের বললে সে ভালো মেয়ে। কোন্‌টা ধরবো বলো তো!

বাঙাল, তোমাকে যতো বোকা দেখায় তুমি ততো নও। তা সেকথা থাক। সুবালা আমার নাম বলে বেড়াচ্ছে বলেই আমার রাগ। নইলে সুবালা যে ভালো মেয়ে তা আমি জানি।

কিভাবে জানো ?

চিনি যে।

ভালো করে চেনো ?

খুব ভালো করে।

এবার বলো।

বলছিলাম কি তাকে একবার দেখো, কথাটথা বলো। যদি তার জন্য তোমার মায়া হয় তাহলে একটা সাহসের কাজ করেই ফেলো।

যে-কাজটা তুমি করতে পারোনি সেইটে তো!

সেইটেই।

তুমি করলেও তো পারতে।

নবীন একটু রসস্থ হয়েছে। গাঢ় গলায় বললো, ভাই রে, আমিই করতুম। কিন্তু গাঁয়ে আমার বউ ছেলে রয়েছে। আমার শ্বশুর আবার মাতব্বর লোক, পার্টি করে। ভয় পাই।

সুবালাকে তোমার পছন্দই ছিলো তবে ?

ছিলো। মিথ্যে কথা বলবো না খুবই পছন্দের মেয়ে।

ঠিক আছে। দেখবো।

তুমি লোকটা বড়ো ভালো হে বাঙাল। বড়ো কলজেওয়ালা লোক, দিলওয়ালা লোক আজকাল আর চোখেই পড়ে না। তাহলে সুবালাকে আজই বলি।

বলবে? কিভাবে বলবে? তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

নবীন খুব সেয়ানা হাসি হেসে বললো, হয়। খুব কান্নাকাটি সইতে পারি না।

তুমি যখন যাবে আমাকেও নিয়ে যেও।

যাবো। সেই কথাই ভালো। একটু নিশুত রাত না হলে সুবিধে হয় না। লীলাময়ীর নজর চারদিকে।

বাঘুর আজকাল কী হয়েছে, সে লোকের কথার যেমন গন্ধ পায় তেমনি আকৃতিও টের পায়। নবীনের কথাগুলো যেন তেরছা, কোনাচে, উঁচু-নিচু। কেমন যেন টকচা গন্ধ আছে তাতে। কথাগুলো সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখলো। সুবালার একটা মুখ সে কল্পনা করে নিলো। গোলপানা, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চোখে চাউনিটা নিস্তেজ।

সুবালাকে নবীন তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে, এটা বেশ বুঝতে পারে বাঘু। কিন্তু সুবালাকে নিয়ে বাঘু যে কী করবে সেটাই তার মাথায় খেললো না। অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারলো না, মেয়েমানুষ দিয়ে তার কী দরকার।

যতীনবাবু রিক্সার সিটে বসে, পাশে বাঘু। আগে বাঘু পাদানিতে উবু হয়ে বসতো, আজকাল যতীনবাবু তাকে পাশেই বসায়। কেন কে জানে। বাঘু বুঝতে পারে না।

যতীন ফেরার পথে বললো, ওহে বাঙাল, আজ একটু হারাধন পাণ্ডার বাড়ি হয়ে যাবো। তোমার জন্যই যাওয়া।

হারাধন পাণ্ডা কে তা বাঘু জানে না। কেউ একজন হবে, পৃথিবীতে কতো মানুষ। হারাধন, যতীন, নবীন, লীলাময়ী, সুবালা..., মানুষের কি

শেষ আছে!

যতীন বললো, হারাধন পাণ্ডার নামও বোধহয় শোনোনি!

না। কে তিনি?

তার ছেলের সঙ্গেই ময়নাকে ঝোলাতে চাইছে লীলাদিদি। জল অনেক দূর গড়িয়েছিলো।

তা হবে। বাঘু কথাগুলো বুঝতে পারে। মানুষে মানুষে নানারকম সম্পর্ক হয়। শরীরের, মনের। বাঘুর কোনোও সম্পর্ক নেই কারও সঙ্গে। সে ভারী একটেরে একপেশে লোক।

যতীন বললো, হারাধনের বিরাট বাড়ি মেলা পয়সা। বুড়ো মরলে পুরো সম্পত্তিটা লীলাময়ী আর ময়না মিলে গাপ করবে। সেই মতলবেই তো প্রদীপের সঙ্গে ময়নাকে ভেড়ানো। হয়েই যাচ্ছিলো ব্যাপারটা। বুড়ো মরতে বসেছিলো। কপাল জোরে বেঁচে গেছে বলে লীলাময়ীর মুখের গ্রাসটা ঝুলে আছে এখনও। তবে আইন মোতাবেক প্রদীপকে ত্যাজ্য-পুত্তুর করলে লীলাময়ীর বাড়া ভাতে ছাই পড়ে। বুড়ো সেইজন্যই ডেকে পাঠিয়েছে। তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি কেন জানো?

কেন।

তোমাকে দেখলে বুড়ো আরও ক্ষেপবে। ত্যাজ্যপুত্তুর না করেই ছাড়বে না। বুড়ো বয়সে বড়ো ঘন ঘন মত বদলায় তো মানুষ।

বাঘু এতো প্যাঁচ ধরতে পারছে না। কথাগুলো মাথায় বসতে সময় নিচ্ছে।

হারাধন পাণ্ডা ভারী নিস্তেজ চোখে সামনের দিকে চেয়ে বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। গায়ে তুশের চাদর। গলায় কমফর্টার। পায়ে মোজা। যতীন বাঘুর পরিচয় দিলো, সামনে ঠেলে দাঁড় করিয়ে আলোয় ভালো করিয়ে দেখালো তাকে। বললো, এই হলো বাঘু মান্না। আপনাকে এর কথা তো বলেছি।

হারাধনের ভাবান্তর হলো না। বাঘুকে নিস্তেজ চোখে একটু দেখে নিয়ে

বললেন, আমার তো সব ছাইমাটি হলো, এখন আর কী করা !
যতীন তাড়াতাড়ি বললো, ভাববেন না দাদা, আইনের প্যাঁচ জোর কষেছি। লীলাময়ী টের পাচ্ছে কত ধানে কত চাল। বাঘু এসে পড়ল, এ একে-বারে ভগবানের আশীর্বাদ। আর কাণ্ডখানাও দেখুন, এসে জুটলো আমার বাড়িতেই। এর মধ্যে ভগবানের কারসাজি না থাকলে এরকম হয় বলুন !
হারাধন যেন গরম হচ্ছেন না। শরীরের সমাধিতে ভারী ডুবে আছেন। এসব কথা ঢেউ খেলছে না মনের মধ্যে। বিড় বিড় করে কী একটু বক-লেন আপন মনে। তার পরে বললেন, সব ছাইমাটি হয়ে গেল।
কে জানে কেন একথাটা বাঘু বুঝলো। কথাটার মধ্যে কর্পূরের মতো একটা গন্ধ আছে। উবে যাচ্ছে, সব উবে যাচ্ছে। ছুনিয়াটাই উবে যাচ্ছে যেন।
বাঘু বলে উঠলো ঠিক কথা।
হারাধন এবার বাঘুর দিকে চাইলেন। ঘোলাটে চোখ। চোখ ভরা জল। বড়ো ডুবে আছেন লোকটা। বিড় বিড় করে কী বললেন। মাথা নাড়-লেন।
যতীন উকিল বলে উঠলো, সর্বনাশ ! কেসতো কেরোসিন দেখছি। বুড়ো যদি টসকায় তাহলে সম্পত্তি চলে গেল বললাম লীলাময়ীর হাতেই।
গেলেও যে যতীন উকিলের ক্ষতিটা কী তা ভালো বুঝতে পারলো না বাঘু। রামের সম্পত্তি যদি শ্যাম পায় তাহলে যতুর তাতে মাথাব্যাথা কেন ? এই কেনর একটা জবাব থাকা দরকার। বাঘু তার নতুন মাথায় এসব প্যাঁচালো ব্যাপার ধরতে পারছে না।
হারাধন বাঘুর দিকেই চেয়েছিলেন। বললেন, যখন ব্যথাটা ওঠে বুঝলে —যখন ব্যথাটা ঠেলে ঠেলে ওঠে—তখন মনে হয় ছুনিয়ায় আর কিছু নেই—শুধু ব্যথাটা আছে আর আমি আছি। ব্যথা উঠলে ছুনিয়াটা ছাইমাটি হয়ে যায়। তখন ছেলে থাকে না, মেয়ে থাকে না, বউ থাকে না, টাকা পয়সা কিচ্ছু থাকে না, ভগবান অবধি বিস্মরণ—ওফ্—কী ব্যথা

রে বাপ।

বাঘু মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা।

যতীন উকিল তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে, আকথায় সময় নষ্ট করো কেন? কাজটা গুছিয়ে নিতে হবে না? এইবেলা সইসাবুদ না হলে পরে পস্তাতে হবে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি কাজটা সেরে নিই ততক্ষণে।

বাইরে শীতের ঘোর-লাগা মায়াবী সন্ধে ঘনিয়ে এলো। কুয়াশার স্বপ্নের মধ্যে জোনাকি জ্বলছে নিবছে। মশার শব্দ ঘন হয়ে এলো। আর ঘন হলো ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। বড্ড শীত। বাঘু সিঁড়িতে বসে চেয়ে রইলো। কতকাল সাদা চোখে সাঁঝ দেখেনি সে। আজকাল দেখে আর মুগ্ধ হয়।

শীতের ভারী বাতাসে একটা চেনা গন্ধ ভেসে এলো বাঘুর নাকে। নাকটা চনমন করে উঠলো। বাঘু চকিতে চারপাশে চাইলো। কোথা থেকে যে আসছে গন্ধটা! একেবারে ম'ম' করছে চারদিক।

বাঘু বাতাস শুঁকতে শুঁকতে উঠে এদিক ওদিক করে সটান হারাধন পাণ্ডার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ালো। যতীন উকিল আর হারাধন দুজনেই গেলাস হাতে বসা। টেবিলে বোতল। খুব চলছে। হারাধনের সেই নিস্তেজ মনমরা ভাবটা আর নেই। শরীরে দিব্যি চনমনে ভাব। মুখে খ্যালখ্যালে হাসি।

বাঘু একটু সরে এলো। যতীন উকিলের মাথায় বুদ্ধিও খেলে বাবা!

ঘণ্টাটাক বাদে যতীন উকিল ফাইল বগলে বেরিয়ে এলো। মুখে হাসি-হাসি ভাব। মদের গন্ধ। বাঘুর দিকে চেয়ে বললো, হয়ে গেল। কাজ ফর্সা।

কী হয়ে গেল তা আর জিজ্ঞেস করলো না বাঘু। জেনে তার কী লাভ? কার সম্পত্তি কার ঘাড়ে অর্শাবে তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তবে তার চোখের সামনে দুনিয়াটা পরতে পরতে ঢাকনা খুলে দিচ্ছে। আগে অনেক কিছুই দেখতে পেত না বাঘু। আজকাল পাচ্ছে। কে যেন অনেক

শতরঞ্চি আর কাঁথাকানি দিয়ে দুনিয়াটা মুড়ে রেখেছিলো। এখন সব ঢাকনা তুলে নিচ্ছে একে একে।

যতীন উকিল্ তার গালের ওপর একটা মোদো গন্ধের শ্বাস ছেড়ে বললো, বুঝলে! মাথায় বুদ্ধিটা চট করে এসে গেল। হারাধন পাণ্ডা হচ্ছে মদে চোবানো মানুষ, তার কি এমন শুকনো থাকলে চলে! দিলুম আবার বোতলের ডোজ। একেবারে হড়হড় হয়ে গেল।

রিক্সা থেকে নামবার সময় নবীন কানে কানে বললো, আজ রাতেই কিন্তু —মনে আছে তো!

আছে।

বারোটার পব আমি আসব।

ঠিক আছে।

বাঘু ঠিক বুঝতে পারছে না, মেয়েমানুষ দিয়ে তার সত্যিই কী হবে। তবে এতে করে যদি নবীনের কিছু সুবিধে হয়, যদি সুবালার ভালো হয়। তবে তার কোনো আপত্তি নেই। দুনিয়াটার পরত খুলছে। কত কী আছে দেখার, জানার।

নিশুতি রাতে নবীন এসে হাজির হলো, আলোয়ানে মাথামুখ ঢেকে। মুখে চোর-চোর ভাব।

বাঙাল, ডুবিও না।

ডোবাবো কেন?

তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। তুমি বড়ো বিটকেল লোক। তা বটে।

কথাটা স্বীকার করছো?

করছি।

৪

পাশাপাশি দুটো চৌকিতে ময়না আর লীলাময়ী। কারও চোখে ঘুম নেই। ময়না যে কেন বারবার এপাশ ওপাশ করে কে জানে।

লীলাময়ী বললেন, ঘুম আসছে না নাকি রে।

না মাসি। যতীন উকিল মাথাটা এমন গরম করে দিয়ে গেল।

মুখে চোখে জল চাপড়ে আয়। ঠাণ্ডা লাগাসনি যেন। আজ আমারও বায়ু চড়েছে।

ময়না উঠলো না লেপমুড়ি দিয়ে পড়ে থেকে বললো, লোকটা যে কত বড় শয়তান।

কার কথা বলছিস?

বাঘু মান্না। জাতে মাতাল, তালে ঠিক।

ওরে তার মাথায় এতো বুদ্ধি নেই। তাকে বুদ্ধি দিয়েছে লোকে।

তা দিক। তা বলে ও বুদ্ধি নেবে কেন?

কী আর করবি অত ভাবিস না। এ সমাজে অবলা মেয়ে মানুষ কিছু একটা বড় কাজ করলেই পুরুষগুলোর আঁতে লাগে। আর কিছু পারুক না-পারুক মেয়েমানুষকে বিপদে ফেলতে তাদের বড়ো সুখ। ওসব গায়ে মাখিসনি। আমার পরে তোকেই সব কাজ করতে হবে। মন শক্ত কর।

আমি খুব শক্ত মাসী। তুমিই বরং নরম। সহজে গলে যাও।

লীলাময়ী প্রথমটায় কিছু বললেন না। একটু বাদে বললেন, নানা কথা কানে আসছে।

কী কথা?

বাঘু মান্নার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। লোকে বলে, বাঘু বাঙাল

পাগলাটে বটে, কিন্তু ভারী ভালো লোক। সে পাঁচজনের জন্য খুব করে।

তোমার বিশ্বাস হয় ?

কি জানি বাবা, তবে গঙ্গারাম ডাক্তার বলছিলো, বাঘু মান্না তার পুকুরের পানা তুলে দিয়েছে, একটি পয়সা নেয়নি। শুধু তাই নয়, দু'বছর আগে গঙ্গার মায়ের আঠারো ভরির বিছে হার জলে পড়ে গিয়েছিলো। সেটাও তুলে দিয়েছে বাঘু।

হলেই বা।

তাই বলছিলাম, হয়তো লোকটা খারাপ নয়। তার সঙ্গে যে বড়ো খারাপ ব্যবহার করেছিলুম সেইটে মনে করে কষ্ট হচ্ছে।

যা করেছিলে ভালোই করেছিলে। তুমি তাকে চেনো না।

তুইও কি চিনিস ?

না। আমার আর চেনার দরকার নেই। তাকে মুছে ফেলেছি।

মুছে ফেলেছিস বেশ করেছিস। তোকে আর তার ঘর করতে বলছি না। বলছিলুম একদিন ডাকিয়ে আনিয়ে বলি, বাছা, কিছু মনে কোরো না। তোমার প্রতি অন্যায় করেছিলুম সেদিন।

আসকারা দিও না মাসী, পেয়ে বসবে।

দুজনে আবার চুপ।

ময়না ভারী বিরক্ত, ভারী জ্বালাতন। সারাদিন "বাঘু মান্না বাঘু মান্না" শুনতে হচ্ছে তাকে আজকাল। এমন কি মশাগুলো যে গুনগুন করছে তার মধ্যেও সে "বাঘু মান্না বাঘু মান্না" শুনতে পায়। হাড়হাভাতে হাড়-গিলে ভিখিরির অধম একটা লোক, যাকে সবাই ভুলে গিয়েছিলো সে আবার বদ মতলব নিয়ে ফিরে এসে জায়গা দখল করতে চাইছে, গলায় গামছা দিয়ে মাসোহারা আদায় করার ফিকির করছে, এটা ভারী অসহ্য লাগে তার। গায়ে বিছুটির জ্বালা, বুকে লঙ্কাবাটার জ্বলুনি। চোখ কচ-কচ করে ঘুমহীনতায়। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর অভিশাপে আর অপ-

মানে তার যেমন চোখে জল আসতে চায়, তেমনি বুকের মধ্যে কোঁস-ফোঁসানিও ওঠে রাগের।

বেশ তো, সেই ওই নপুংসককে না হয় মাসোহারাই দেবে। একটা আখাম্বা পুরুষ একজন মেয়েমানুষের কাছ থেকে নিক না হাঁটু গেড়ে বসে খোর-পোষ। পাঁচজন দেখুক সেই উলট-পুরাণ। বেশ হবে।

ভাবতে ভাবতে উঠে বাথরুমে গেল ময়না। চোখে মুখে ঘাড়ে হিমঠাণ্ডা জল দিলো ইচ্ছেমতো। হোক জ্বর সর্দি, হোক নিউমোনিয়া। মরতে কোনোও মেয়েই ভয় পায় না।

লীলাময়ী শেষ রাতে ঘুমিয়েছেন। ময়নার ঘুম এলই না।

দিন তিনেক বাদে সুবালা লীলাময়ীকে বললো, মা, তোমাকে আর যন্ত্রণা দেবো না। আমি চলে যাবো।

কোথায় যাবি ? মরবি নাকি ?

না। মরতে ইচ্ছে যায় না গো। মরলে যে দুটো প্রাণ যাবে।

নবীন কি কোনোও ব্যবস্থা করেছে ? সে তো পালিয়ে বেড়ায়।

সে নয়। অন্য লোক।

কাকে জোটালি ? বন্দোবস্তই বা কি রকম ?

তোমাকে না জানিয়ে তো কিছু করবো না মা। তবে কথাটা বলতে লজ্জা করে বড়ো।

যে লজ্জা বাধিয়ে বসে আছিস তার চেয়ে বেশি লজ্জার আর কী হবে ?

একজন সব জেনেশুনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

বিয়ে ! সত্যিকারের বিয়ে, নাকি বিয়ের নামে একটা ভড়ং। শেষে দুদিন বাদে যদি লাথি দিয়ে তাড়ায় তখন কি করবি ?

সে সে রকম লোক নয়।

কি করে বলছিস ? এত তাড়াতাড়ি জোটালিই বা কোত্থেকে ?

জুটে গেল মা। আমার কথা সব শুনেটুনে বললো, আমার চালচুলো নেই, গতরখানা শুধু আছে। জন্মেও কোনোও কাজ করিনি কখনো। তবে যদি

রাজি থাকো বিয়ে করতে তাহলে খাটবো।

এ আবার কেমনধারা কথা! কোন্ লক্ষ্মীছাড়াকে জোটালি! তাকে এনে দাঁড় করা আগে আমার সামনে। তাকে আগে দেখি, তার কথা শুনি, তবে মত দেবো। শেষে একটা যার তার সঙ্গে গিয়ে যদি জুটিস তবে আমারই বদনাম হবে। বদনাম করার লোকের অভাব নেই, সব মুখিয়েই আছে।

সুবালা একটু কাঁদলো। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ার সিঁড়িতে সসঙ্কোচে বসে বললো, বদনাম তোমার কম তো হয়নি মা আমার জন্য। আর বেশি কী-ই বা হবে।

কাঁদিস না, যদি সে লোক ভালো হয়ে থাকে তবে না হয় বেকার হলে◦ তার একটা কাজ জুটিয়ে দিতে বলবো কাউকে। কথা তো সেটা নয়। কথা হলো, তুই এত হাল্কা মনের মেয়ে কেন রে? এই তো সেদিন নবীনেব সঙ্গে ঢলাঢলি করলি, তারপর আবার এখন আর একজনের দিকে ঝুঁকে-ছিস। এত সস্তা যদি হয়ে যাস তবে কপালে যে দুঃখ আছে। চট করে ঢলে পড়িস কেন?

সুবালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এটা সে বৃত্তান্ত নয়।

তাহলে কোন্ বৃত্তান্ত? ,

সুবালা ঘাড় হেঁট করলো। খুব সংকোচের সঙ্গে বললো, নবীনের সঙ্গে যেরকমধারা ছিলো এটা সেরকম নয়। ঢলাঢালি নয়, আমার দুঃখের কথা শুনে লোকটা পাশে দাঁড়াতে রাজি। নবীনই এনেছে একে।

নবীন! বলিস কী? বলে লীলাময়ী বাক্যহারা হলেন।

সুবালা ফের কাঁদলো। নিজের আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে আর খুলতে খুলতে বললো, নবীনের ভয়ে তুমি ওকে পুলিশে দেবে। তাই ও আমার জন্য পাত্র জুটিয়ে এনেছে।

লীলাময়ীর তবু বাক্য সরলো না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এরকমও হয় নাকি রে? সে তোকে নষ্ট করলো, তারপর আবার পাত্র

জোটালো ! তুইও রাজি হলি নির্লজ্জ কোথাকার ?

কী করবো ? রাজি না হলে যে তোমার লজ্জা ?

ময়না কুটনো কুটছিলো। কাজ থামিয়ে কথা শুনতে হচ্ছিলো তাকে। এরকম ঘটনা সে আগে শোনেনি। এবার মাসীর দিকে চেয়ে বললো, বাধা দিচ্ছো কেন মাসী ? সুবালার যদি এতে একটা হিল্লে হয় তো হোক না।

লীলাময়ী সন্দিহান চোখে ময়নার দিকে চেয়ে বললেন, এটা হিল্লে না। কোন্ ষড়যন্ত্র তা কে বলবে ? যদি নিয়ে গিয়ে আর কাউকে বেচে টেচে দেয় তখন ? মেয়েদের নিয়ে কত খারাপ ব্যবসা আছে !

কথাটা শুনতে পেয়ে অশ্রুমুখী সুবালা মাথা নেড়ে বললো, এ আমাকে বেচবে না মা।

তুই তাকে চিনিস ?

তোমরাও চেনো।

কে সে বলবি তো !

বললে ছোটো মুখে বড় কথা হয়ে যায় যদি !

ছোটো মুখে বড় কথা ! কেন, ও কথা বলছিস কেন ?

সে যে তোমাদের আত্মীয়, ময়নাদিদির…

বাকিটা শুনতে হলো না ময়নার। কানটান সব ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো এক ভয়ঙ্কর অপমানে, লজ্জায়, ঘেন্নায়।

লীলাময়ী বললেন, কে বললি ?

বলিনি এখনো। বলবো বলে চেষ্টা করছি, মুখে আসছে না, ভয় করছে।

ময়নাদিদি না কী যেন বললি ?

সেই কথাই তো। পাত্র হলো বাঘু মান্না।

লীলাময়ী ফের বাক্যহারা হলেন।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। সুবালা এই অসহ্য নীরবতা সহ্য করতে পারছিলো না। তার মন বলছিলো, পাপ হচ্ছে, সুতরাং

নীরবতা সহ্য করতে পারছিলো না। নীরবতা ভেঙে সে-ই বললো, কাজটা কি পাপ হলো মা ? কিন্তু আমার তো দোষ নেই।

লীলাময়ী অনেকক্ষণ বাদে ধরে থাকা দমটা ছাড়লেন। তারপর বললেন, না, পাপ হবে কেন ? তাকে তো ময়না কবে ছেড়ে দিয়েছে। সম্পর্কও চুকেবুকে গেছে। তোর কোনো পাপ হয়নি।

আমি বড়ো ভয় পাচ্ছিলুম বলতে। তারপর ভাবলুম, ময়নাদিদির বিয়ে তো প্রদীপবাবুর সঙ্গে একরকম ঠিকঠাক, হয়তো তোমরা আমাকে খারাপ ভাববে না।

ভাবিনি।

ময়না ফের আলুর খোসা ছাড়াতে লাগলো বটে, কিন্তু তার ভারী অপমান লাগছিলো। অথচ অপমান বোধ করার তেমন কোনোও স্পষ্ট কারণ নেই। বাঘু মান্না মাতাল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। তার ওপর হাড়হাভাতে, কপর্দকশূন্য। তাকে কবে বাতিল করে দিয়েছে ময়না। তবু যে অপমান বোধ করছে সে, তার কারণ বোধহয়, সুবালার মতো নষ্ট মেয়েছেলের সঙ্গে বা বাঘুর নাম জড়ানো বলে। বাঘুর সঙ্গে ময়নার নামটাও তো জড়ানো। এতে একটা গোলমেলে সূক্ষ্ম এবং অবুঝ অপমান হচ্ছে ময়নার।

লীলাময়ী একটু বাদে সামান্য গাঢ় গলায় বললেন, ভালো করে খোঁজটোজ না নিয়ে কিছু করিসনি। শুনেছি সে খুব মাতাল।

আমার আর বাছাবাছি করার উপায় নেই মা। তবে সে আর মদটদ খায় না।

খায় না ঠিক জানিস ?

জানি মা। বাঘু বাঙালকে এ তল্লাটের সবাই চিনে গেছে কিনা। মাতাল নয়, তবে ক্ষ্যাপাটে গোছের।

সে আবার কিরকম ? পাগল টাগল নাকি ?

সুবালা এত দুঃখেও একটু হাসলো। বললো, পাগল আর বলি কী করে! তেমন পাগল নয়। তবে বিটকেল কিম্ভুত সব কথা বলে। আমাকে কী

বললো জানো মা? বললো, তোমার কথাগুলো বেশ গোল গোল, আর তাতে মৌরির গন্ধ আছে।

ওমা: সে কি কথা রে!!

তাই তো বলছি, একটু ক্ষ্যাপা আছে লোকটা। বললো, মানুষের কথা বুঝতে আমার একটু সময় লাগে। আগে তো নেশার ঘোরে ছুনিয়াটা ডুবে থাকতো। আজকাল চারদিকটা বড্ড ভেসে উঠেছে, কত আলো, কত রং, কত কাজ, কত কথা।

তাহলে তো মাথার বেশ দোষ আছে বলতে হয়।

তা একটু আছে।

লীলাময়ী বিরস গলায় বললেন, তুই যখন আমার কাছে এসেছিলি তখন তো তোর এতটুকু বয়স। তোর গেঁজেল বাপ পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর গিয়ে মাসটাক বাদে ফাঁসিতে লটকালো। মেয়ের মতো মানুষ করেছি। যা করবি এবার থেকে ভেবেচিন্তে করবি।

আমাদের গবেট মাথা মা, ভাবনাচিন্তা কি আর আসে।

তাকে একবার আনতে পারিস আমার কাছে?

বাঘুকে? সে তোমাকে যমের মতো ভয় পায়।

কেন আমাকে ভয়ের কি?

সে জানি না।

একবার তাকে একটু দেখতুম। কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলুম তো। ছেলেটা কষ্ট পেয়েছে খুব।

কষ্ট কিসের মা! বাঘুর তার চেয়ে ঢের বেশি ছুর্গতি গেছে। ওসব সে মনে রাখেনি।

যদি তাকে আনতে পারিস তো ভালো। আর বলিস, বিয়ে করলে বিয়ের মতোই করতে হবে। মন্ত্র পড়তে হবে, মালাবদল করতে হবে। লোকজনকে খাওয়াতেও হবে।

সুবালা ভয়-খাওয়া গলায় বললো, কে করবে মা অতো? তার অবস্থা তো

জানো।

আমি কিছু খরচ দেবো। বলিস তাকে।

বলবো।

সুবালা উঠে গেল। ময়না মাথা নিচু করে যেমন কাজ করছিলো তেমনি করে-যেতে লাগলো। লীলাময়ী তার দিকে একবার তাকালেন। কী একটা বলি-বলি করেও বললেন না।

ময়না হঠাৎ কাটা তরকারির থালাটা সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে গেল। লীলাময়ী কিছু বুঝলেন না। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রদীপ পাণ্ডার সঙ্গে ময়নার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। হারাধন বেঁচে থাকতে তা কি হবে ?

বাঘু খোরপোষ চাইছে। বাঘু সুবালাকে বিয়ে করছে। এসব গোলমেলে ব্যাপার কেন ঘটছে তা বুঝতে পারছিলো না ময়না। শুধু টের পাচ্ছে তার ভিতরটা অপমানে জ্বালায় ঝাঁ-ঝাঁ করে পুড়ে যাচ্ছে। তার কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করে নতুন বউ নিয়ে সংসার পাতবে নাকি শয়তানটা ? এত দূর ! ময়না তো ভাবতেই পারছে না ঘটনাটা।

সারাদিন এমন আনমনা রইলো ময়না, যে, ইস্কুলে পড়াতেই পারলো না ভালো করে। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে পড়লো ছুটির আগেই। তার মনে হচ্ছে এর একটা বিহিত করা দরকার।

যতীন উকিলের বাড়ি যখন হাজির হলো ময়না তখন পড়ন্ত বেলা। বাড়িতে কেউ আছে বলে প্রথমটায় মনে হলো না। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটা লোক ঘুমচোখে এসে দরজা খুললো। আর ময়না হাঁ হয়ে গেল লোকটাকে দেখে।

এ সেই লোকই বটে। তবে হাড়হাভাতে ভাবটা আর নেই। গালে নরম দাড়ি, চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। বেশ দেখাচ্ছে।

ভারী ভীতু চোখে চেয়ে লোকটা বললো, কাকে খুঁজছেন ? বউঠান শীতলা-বাড়িতে, উকিলবাবু কাছারিতে।

আর বাঘু মান্না ?

লোকটা যেন ভয় পেয়ে এক পা সরে গেল, আমিই।

ময়না ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দাঁড়ালো মুখোমুখি, সুবালাকে নাকি বিয়ে করার ইচ্ছে !

লোকটা চিনতে পারছে না ময়নাকে। দুচোখে ভরা বিস্ময়ে নিয়ে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক জানি না। আপনি কি তার কেউ হন ?

ময়নার চোখ দুটো জ্বলন্ত হয়ে উঠছিলো ক্রমে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, বিয়ে করার মতলবটা মাথায় ঢোকালো কে ?

বাঘু মাথা চুলকে অসহায় ভাব করে বললো, ভাবলুম মেয়েটার যদি উপকার হয়। নবীনও ধরে পড়েছিলো খুব।

শুধু সেইজন্য ? নাকি নিজেরও ইচ্ছে ছিলো !

মেয়েমানুষ দিয়ে আমার কী হবে বলুন ! না, আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছু নেই।

লোকে বললেই নাচতে হবে ? পুরুষমানুষ নাকি হনুমান ?

বাঘু একটু হাসলো, আপনি বোধহয় তার কেউ হবেন। বোন টোন বোধ হয়। আমার কোনোও দোষ নেই কিন্তু। সুবালা বড়ো আতান্তরে পড়েছে। লীলাময়ীর ওখানেও সুবিধে হচ্ছে না।

ওঃ সুবালার দুঃখে তো নাল গড়াচ্ছে দেখছি ?

বাঘু আবেগে মাথা নেড়ে বললো, না না, আমি ঠিক ওরকম নয়।

তাহলে কিরকম ?

বাঘু অসহায়ভাবে চারিদিক তাকালো। তারপর বললো, কিরকম তা কি আমিই জানি ! বড্ড নেশা করতুম এককালে। দুনিয়াটাও চেনা হলো না, আমি কেমন মানুষ তাও ঠাওর পেলুম না। এখন বুঝবার চেষ্টা করছি।

আক্কেলটা কবে হলো !

সে অনেক কথা। বলতে গেলে মহাভারত।

এই পোড়া মুখখানাকে বোধহয় মনেও পড়ে না!

বাঘু বড়ো বড়ো চোখ মুখখানা দেখে। কিছু মনে পড়ে কি?

ময়না ঝংকার দিয়ে বললো, শুভদৃষ্টির সময় তো চোখে পড়েছিলো, না কি?

বাঘু হঠাৎ সভয়ে আরোও দু-পা পিছিয়ে গেল। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বললো, আপনি কি লীলাময়ীর সে-ই বোনঝি!

কেন, আর কোনো সম্পর্কের কথা মনে পড়লো না? নেশার ঘোর কি এখনো কাটেনি নাকি!

বাঘুর মনে পড়েছে, কিন্তু সে মাথা নেড়ে বললো, সে সম্পর্ক তো ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে। লীলাময়ীর কাছে আদালতের রায় আছে।

তাই বুঝি সুবালার সঙ্গে খুব মাখামাখির সুবিধে হয়েছে!

বাঘু একটু বিপন্ন বোধ করলো। হঠাৎ মাথা নেড়ে বললো, আপনি যা বলছেন এর মধ্যে গরম মশলার গন্ধ পাচ্ছি। কথাগুলো ভারী অদ্ভুত। দুবো ঘাসের মতো সরু সরু, কচি, সবুজ।

বাঃ, কথার তো খুব গোছ দেখছি।

কী করবো, আমার যে ওরকমই মনে হচ্ছে।

ময়না ফোঁস করে একটা শব্দ করলো। তারপর অনবরত ফোঁস-ফোঁস। সে যে কাঁদছে, ভীষণ কাঁদছে এটা বুঝতে তার অনেকক্ষণ সময় লাগলো। সে বাঘু মান্নার ভূত ঝেড়ে দিতে এসেছিলো, তবে কাঁদে কেন? সে বুঝতে পারছে না।

বাঘু এক পা এগোলো। আরোও এক পা। দ্বিধা, ভয়।

ময়না এগোলো চিতাবাঘের মতো।

তারপর যা হলো, তা ভারী লজ্জার কথা। কহতব্য নয়।